উপ-আঞ্চলিকতা ও বাংলাদেশের উন্নয়ন কূটনীতি

আবুল কালাম*

সার-সংক্ষেপ: উপ-আঞ্চলিকতা সহযোগিতা বিষয়ক সাম্প্রতিকতম ধারণা। এর ভিত্তিমূলে রয়েছে উন্নয়নের প্রত্যাশা। তত্ত্বগত দৃষ্টিকোণ থেকে, উপ-আঞ্চলিকতা আঞ্চলিকতার মতোই ইতিবাচক উদ্যোগ বলে বিবেচিত। কিন্তু শান্তি ও সহযোগিতার মতো উন্নয়ন বা প্রবৃদ্ধি প্রায়শ আন্তরাষ্ট্রিক সম্পর্কে প্রতারণা বা ছলনামূলক বলে মনে হয়। কেননা অনেকক্ষেত্রে এসব ধারণা রাজনীতির হীনস্বার্থ চরিতার্থতার অপব্যবহৃত হয়ে থাকে।

উপর্যুক্ত পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায় রেখে প্রবন্ধে দক্ষিন এশীয় (উপ-আঞ্চলিক) উন্নয়ন চতুর্ভূজসহ বাংলাদেশের উন্নয়ন কূটনীতির পটভূমি, প্রক্রিয়া ও সাংগঠনিক অভিব্যক্তি পর্যালোচনা করা হয়েছে। ধারণাগত দৃষ্টিকোন বিবেচনা করে প্রবন্ধকার উপ-আঞ্চলিকতাকে বাংলাদেশের উন্নয়ন কূটনীতির ইতিবাচক দিক বলে মনে করেন, কেননা এ ধারণা ১৯৭০ এর শেষপাদ থেকে আঞ্চলিক পর্যায়ে সূচনাকৃত সহযোগিতার ধারা অব্যাহত রাখা বা প্রসার করার অংশ হিসেবে দেখা যেতে পারে।

কিন্তু বাংলাদেশের উপ-আঞ্চলিকতা ও উন্নয়ন কূটনীতির সাম্প্রতিককালীন উদ্যোগ, সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়া ও সাংগঠনিক অভিব্যক্তিসহ এ সম্পর্কিত বিষয়াদির সকল পরিপ্রেক্ষিত পর্যালোচনা করে প্রবন্ধকার মনে করেন যে, এসব ক্ষেত্রে বাংলাদেশের উদ্যোগ জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ বা প্রসারের চেয়ে অধিকতর সমস্যা সৃষ্টি করে চলছে। প্রবন্ধে রাজনৈতিক লেজুড়বৃত্তি ও অতিশয় ভাবাবেগ পরিহার করার ওপর জোর দেয়া হয়, সুপারিশ করা হয় আঞ্চলিক, উপ-আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে সমঝোতা সৃষ্টির। বর্তমানে প্রস্তাবিত ও বহুল প্রচারিত বহুমাত্রিক খাত ভিত্তিক উপ-আঞ্চলিক 'উন্নয়নের' পরিবর্তে প্রবন্ধকার সুপারিশ করেন এমন জাতীয় ও উপ-আঞ্চলিক পরিবেশ সৃষ্টি যাতে প্রয়োগিক ক্রম উন্নয়ন ধারায় বা একক খাত ভিত্তিক উপ-আঞ্চলিক উন্নয়ন সহযোগিতা স্থাপন সম্ভব হয়।

ভূমিকা

আঞ্চলিকতা, উপ-আঞ্চলিকতা[১] ও আন্ত:আঞ্চলিক সম্পর্ক ও সহযোগিতা খুব বেশী দিন আগের বিষয় নয়। ধারণা হিসাবে এসব আপেক্ষিকভাবে নতুন, অভিনব। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ উত্তরকালে আন্তর্জাতিক সিস্টেমের বিবর্তনের ফলে ক্রমান্বয়ে এসব ধারণা প্রবর্তিত হয়। এসব ধারণা সর্ববিধ সংকট ও দ্বন্দ্ব থেকে পরিত্রাণ লাভের উদ্দেশ্যে ও আন্ত:রাষ্ট্রিক সম্পর্ক উন্নয়নকল্পে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। আরো উদ্দেশ্য হচ্ছে উন্নয়ন জোরদার করা। তাই এ ধরনের প্রয়াস সাধারণত ইতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়।[২]

---

* অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

উপর্যুক্ত ধারণাসমূহের বিবর্তন ও বাস্তবায়নে ভৌগোলিক নৈকট্যের উপাদান-ই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন। তিনটি ধারণার মধ্যে 'উপ-আঞ্চলিকতা' হচ্ছে অতি সাম্প্রতিক। এর ভিত্তিমূলে রয়েছে উন্নয়নের প্রত্যাশা। অবশ্য উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করতে হলে প্রয়োজন শান্তিপুর্ন কৌশলগত পরিবেশ যাতে বৃহত্তর জনমানুষের উন্নয়নের আশা-আকাঙ্ক্ষার সম্পূরণ ঘটে, গড়ে ওঠে সাংস্কৃতিক বন্ধন, প্রসার লাভ করে অর্থনৈতিক সহযোগিতা। পরিশেষে, তত্ত্বীয়ভাবে এ ধরনের সহযোগিতা ও সাহায্যের পেছনে আন্তর্জাতিক সিস্টেমের স্থিতিশীলতা বিধানের বিষয়ও কাজ করে, কেননা এর মাধ্যমে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিষয়াদিতে সমষ্টিগত চাপ সৃষ্টি করা চলে। এসব বহুবিধ কারণে রাজনৈতিক নীতি-নির্ধারকবৃন্দ, বুদ্ধিজীবী ও চিন্তাবিদবর্গ এবং ব্যবসায়িক গোষ্ঠী নির্বিশেষে প্রায় সবাই আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতাসহ সকল পর্যায়ে অধিকতর সহযোগিতায় প্রত্যাশী।

ধারণাগত দৃষ্টিকোন

আঞ্চলিক সহযোগিতা বা উপ-আঞ্চলিক পর্যায়ে উন্নয়ন সম্পর্ক ধারণাগতভাবে ব্যাপকতর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক প্রত্যয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এসব প্রত্যয়ের মধ্যে রয়েছে "শান্তি," "শান্তি প্রক্রিয়ার", "শান্তি সংস্থাপন", এবং "দন্দ্ব নিরসন" বা "দন্দ্বের সমাধান" প্রভৃতি। প্রত্যয়গত দৃষ্টিকোণ থেকে, শান্তি, উন্নয়ন, প্রবৃদ্ধি ও দ্বন্দের ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এবং অর্থের দিক থেকে অন্তর্নিহিতভাবে সম্পৃক্ত। অনেক সময় এসব প্রত্যয় সমার্থে ব্যবহৃত হয় - একটির সূচনা বা সূত্রপাত আরেকটির মাধ্যমে সমাপ্ত হয়। প্রক্রিয়াগতভাবে এসব প্রত্যয় ব্যবহারের উদ্দেশ্য হচ্ছে আন্ত:রাষ্ট্রিক সম্পর্ককে পারস্পরিক স্বার্থ অর্জনে, সন্তুষ্ট বিধানে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, মতপার্থক্য গঠনমূলকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাতে দ্বন্দ্ব সম্প্রসারিত হয়ে সহিংসতার রূপ পরিগ্রহ না করে, সম্পর্ক ইতিবাচক গতিতে অব্যাহত ধারায় গড়ে ওঠে। উপরন্তু, বিশ্ব মানবতার সার্বজনীন কল্যান সাধন এবং জাতি রাষ্ট্রসমূহের সম্পর্কের শান্তিপূর্ণ সামঞ্জস্য বিধানে যেসব অবস্থা প্রয়োজন সেসব অর্জন করাও এসব ধারণাগত প্রত্যয়ের লক্ষ্য। মূল লক্ষ্য হচ্ছে শান্তি, আর শান্তি প্রক্রিয়ার কাজ হচ্ছে দ্বান্দ্বিক সম্পর্ককে এভাবে নিয়ন্ত্রন করা যাতে সুসম্পর্কের সাধারণ বা স্বাভাবিক উত্তরণ হয়, স্বিতিশীলতা আসে, উন্নয়ন ঘটে, সম্ভব হয় সংহতিপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা। এভাবে শান্তির প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দ্বান্দ্বিক আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করা চলে, রাষ্ট্রগুলোকে গড়তে হয় এমন ধরনের সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান যার মাধ্যমে পারস্পরিক উন্নয়ন, প্রবৃদ্ধি ও সংহতির স্বাভাবিক অভিলাষ পূর্ণ হয়, ত্বরান্বিত হয় অধিকতর শান্তি অর্জনের গতি।[২]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরিসমাপ্তির পর থেকে আন্তর্জাতিক সিস্টেম ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়ে চলছে। প্রায় একই সঙ্গে পরিবর্তিত বিশ্বব্যবস্থার সাথে তাল মিলিয়ে ধারণাগত দৃষ্টিকোণও রূপান্তরিত হয়ে চলছে। আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে পুরণো তত্ত্বীয় ধারণাসমূহের মধ্যে রয়েছে "প্রয়োগবাদ" এবং নব্য-প্রায়োগিক" চিন্তাধারা। দুটো ধারণারই লক্ষ্য হচ্ছে আঞ্চলিক পর্যায়ে এমন ধরনের সহযোগিতা কাঠামো গড়ে তোলা যাতে "জাতি রাষ্ট্রের একচেটিয়া সুবিধা অর্জনের প্রত্যাশা রূপান্তরিত হয়ে বৃহত্তর সংস্থার মাধ্যমে সমষ্টিগত স্বার্থ প্রতিষ্ঠার রূপ পরিগ্রহ করে।"[৪]

স্নায়ুযুদ্ধ উত্তরকালে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অনেক ক্ষেত্রে অনিশ্চিত ভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। আন্তর্জাতিক নীতিনির্ধারক ও বিশ্লেষকদের অনেক নতুন নতুন দৃষ্টিকোণ উপস্থাপন করেন। নব-উদ্ভাবিত এসব দৃষ্টিকোণের মধ্যে রয়েছে "সহযোগিতামূলক নিরাপত্তা", "সহযোগিতাধর্মী অঙ্গীকার" অথবা "পারস্পরিক নির্ভরশীল উন্নয়ন" প্রভৃতি। এসবের উদ্দেশ্য হচ্ছে রাষ্ট্রের/জাতির অর্থনৈতিক উন্নয়ন বা নিরাপত্তার ক্ষেত্রে একক বা ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োগের পরিবর্তে সচেতনভাবে উপ-আঞ্চলিক, আঞ্চলিক ও আন্ত:আঞ্চলিক পর্যায়ে সমন্বিত প্রয়াসে উদ্যোগী হওয়া যাতে দ্বন্দ্ব এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়, সম্ভব হয় উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি অর্জনের মানুষের মৌলিক চাহিদা সম্পূরণ। একমাত্র সহযোগিতার মাধ্যমে যৌথশক্তির সমন্বয় সম্ভব। এতে রাষ্ট্র তার একক প্রয়াসের মাধ্যমে নিজস্ব স্বার্থ অর্জন সহ যৌথ প্রয়াস থেকেও লাভবান হতে পারে।

উল্লেখ্য, ১৯৫০ -এর দশকে পশ্চিম ইউরোপে-ই প্রথম আঞ্চলিকতার প্রয়াসে উদ্যোগী হয়। পরবর্তী দশকগুলোতে পশ্চিম ইউরোপের এ উদ্যোগ ঐক্যবদ্ধ ইউরোপ গড়ে তোলার আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। অর্থনৈতিক ও ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে পশ্চিম ইউরোপের উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির এ দৃষ্টান্ত পরবর্তীকালে বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলেও অনুকরণ করা হয়।

এ প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে, শান্তির মতো উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধিও প্রায়শ ছলনামূলক বলে প্রতিভাত হয়, কেননা প্রায়শ এসব ধারণা রাজনীতির হীনস্বার্থ চরিতার্থতায় অপব্যবহৃত বা ব্যবহৃত আসছে। এটা হতাশাব্যঞ্জক বা প্রতারণামূলক মনে হতে পারে বটে, কিন্তু দক্ষিন এশিয়া বিশেষ করে বাংলাদেশ জাতীয় পর্যায়ে সেই উন্নয়নমূলক সহযোগিতার নামে রাজনৈতিক ভাবে ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছে, দ্বন্দ্বের যে-ধারা প্রকৃত অর্থে উন্নয়নের মাধ্যমে পরিহার করার ওপর জোর দেয়া হয়ে থাকে।

উপর্যুক্ত ধারণাগত দৃষ্টিকোণ ও ঐতিহাসিক বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিত মনে রেখে প্রবন্ধে দক্ষিন এশিয়ায় আঞ্চলিকতার প্রয়াস এবং সাম্প্রতিককালীন উপ-আঞ্চলিক উদ্যোগের পর্যালোচনা করা হয়েছে। ধারণাগত দিক থেকে প্রবন্ধে উপ-আঞ্চলিক উদ্দ্যোগকে ইতিবাচক ভাবে দেখা হয়েছে, কিন্তু আঞ্চলিক ও রাজনীতির বাস্তব পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনা করে একে সমালোচনার দৃষ্টিতে মূল্যায়ন করা হয়, কেননা এ উদ্যোগ সম্পর্কিত বাংলাদেশের সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ার বর্তমান প্রেক্ষিতে এটাই অধিকতর প্রতীয়মান হয় যে, উপ-আঞ্চলিক জোটের প্রস্তাব এখনো বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের চেয়ে অধিকতর সমস্যা সৃষ্টি করে চলছে। প্রবন্ধে রাজনৈতিক ভাবাবেগ পরিহারের ওপর জোর দেয়া হয়, সুপারিশ করা হয় সমঝোতা সৃষ্টির; একই সঙ্গে বহুল-প্রচারিত বহুমাত্রিক খাত ভিত্তিক উপ-আঞ্চলিক উন্নয়নের পরিবর্তে প্রয়োগিক ক্রম-উন্নয়ন ধারায় বা একক খাত ভিত্তিক উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার ওপর জোর দেয়া হয়।

এশীয় সহযোগিতার পটভূমি

এশিয়া মহাদেশে প্রকৃত সহযোগিতার ইতিহাস বেশী দিনের নয়, কিন্তু অভিলাষ-প্রত্যাশা অনেক দিনের। বিশেষ করে, স্বাধীনতা লাভের পর থেকে দক্ষিন ও দক্ষিন পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো তাদের নবলব্দ স্বাধীনতা, নিরাপত্তা ও উন্নয়নের জন্য নিরন্তর সহযোগিতার প্রক্রিয়ায় তৎপর ছিল। এধরনের কাজ কখনো সহজসাধ্য ছিলনা। উদ্যোগ, সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার অনেক ক্ষেত্রে বিভ্রান্তিও ছিল। কারণও ছিল অসংখ্য । উপনিবেশবাদের ঐতিহ্যিক সূত্র, জাতি-রাষ্ট্র গঠনের অগনিত সমস্যা, নেতৃত্বের সংকট, দিক-নির্দেশনার অভাব, ঐতিহ্যিক মতবাদ ও সম্পদের অভাব এসব বহুদিক থেকে প্রায় প্রতিটি দেশ ছিল সংকটাপন্ন। তদুপরি আসে বহি:শক্তিসমুহের চাপ। ফলে নিজেরা নিজেদের নীতি-কৌশল প্রনয়নে সমর্থ হয়নি, প্রায়শ বৈদেশিক কৌশলগত নীতি দ্বারা পরিচালিত হয়। নিজেদের উন্নয়নমূলক আশা-আকাঙ্ক্ষার সম্পূরণে এবং জনগণের নিরাপত্তা বিধানে প্রায় ক্ষেত্রে এসব দেশ যে ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে সেসব ছিল বিক্ষিপ্ত ও বিভিন্নমুখী। সমন্বিত প্রয়াস ছিল দুষ্কর বা ক্ষণস্থায়ী। তাই এ দু'অঞ্চলে আঞ্চলিকতার ইতিহাস আপেক্ষিকভাবে নতুন।

বর্তমানে দক্ষিন-পূর্ব এশিয়া ও দক্ষিণ এশিয়া উভয় অঞ্চলেই আঞ্চলিক সংস্থা রয়েছে। দক্ষিন-পুর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক সংগঠক 'আসিয়ান' গঠিত হয় ১৯৬৭ সনে অনেকটা অঞ্চলব্যাপী কমুনিস্ট আন্দোলন ও বিদ্রোহমূলক তোড়জোড়ের পটভূমিতে, যদিও এ সংগঠন ১৯৭৫ সনে সাইগনের পতনের পূর্বাবধি তেমন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সমর্থ হয়নি। পক্ষান্তরে, দক্ষিন এশিয় আঞ্চলিক সংস্থা

সার্ক আনুষ্ঠানিক ভাবে গঠিত হয় ১৯৮৫ সনে। আঞ্চলিক সংস্থাসমূহের মধ্যে সার্ক হচ্ছে কনিষ্ঠতম, যদিও সার্কের প্রকৃত স্বপ্নদ্রষ্টা বাংলাদেশের তদানিন্তন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ১৯৭৭ সন থেকে আঞ্চলিকতার ধারণা নিয়ে অঞ্চলব্যাপী যোগাযোগ স্থাপন করেন। শেষ পর্যন্ত এই সংগঠন জন্ম লাভ হয় এ অঞ্চলের জটিল ইতিহাস, ভৌগোলিক অবস্থা ও অপ্রতিসম ভূ-রাজনীতির প্রেক্ষাপটে।

সার্কের ''ধীরে চলো গতি''

সার্কের সঙ্গে আসিয়ানের তুলনা করা হলে সার্কের মাধ্যমে আঞ্চলিকতার অগ্রগতি সম্পর্কে হতাশার উদ্রেক করে। অথচ সার্কদেশের নেতৃবর্গ উচ্চতম পর্যায়ে প্রায় প্রতি বছর শীর্ষ বৈঠকে বসেন। এ ধরনের উচ্চমাত্রার আলেখ্য সত্ত্বেও দক্ষিন এশিয়ায় আঞ্চলিকতার অন্বেষায় সার্ক ''ধীরে চলো'' পথ অবলম্বন করে। পক্ষান্তরে, তুলনামূলকভাবে নিম্নমাত্রার কূটনীতি অবলম্বন করেও প্রতিবেশী আসিয়ান দ্রুততর প্রক্রিয়ায় একই সঙ্গে সংহতি ও উন্নয়নের মাত্রার অগ্রগামী হয়ে আছে। ''পারস্পারিক আন্ত:নির্ভশীল উন্নয়নের'' ধারণা গ্রহন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে আসিয়ান দেশগুলো তাদের সমষ্টিগত শক্তির সমন্বয় ঘটায় এবং সম্প্রতি পরিলক্ষিত সাময়িক অর্থনীতিক বিপর্যয় সত্ত্বেও আসিয়ান জোট একটি শক্তিশালী ব্যবসায়িক জোট হিসাবে তার খ্যাতি অক্ষুন্ন রেখেছে।[৭] অথচ সার্কভূক্ত দেশগুলোর মধ্যে এখনো বাণিজ্যিক লেনদেন তুচ্ছই বলা চলে এবং এসব দেশ দারিদ্রের ফাঁদে আটক বলে প্রতীয়মান হয়। এভাবে সার্ক আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রতিষ্ঠার এক যুগ অধিককাল পরেও দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক ভাবমুর্তির আলেখ্য হচ্ছে ''শাহী কায়দায় বৈঠক-সম্মেলন, কৃতিত্বে নিম্নমান''। আঞ্চলিকতার প্রয়াসে আসিয়ানের সাফল্য প্রকৃত অর্থে অনুপ্রেরণা ও ঈর্ষার উদ্রেক করে।

আসিয়ানের উন্নয়ন ত্রিভূজ

আসিয়ানের আঞ্চলিকতার প্রয়াস বহুমাত্রিক ধরন ও রূপ পরিগ্রহ করে। প্রথমত, দক্ষিন পূর্ব এশিয়ার অভ্যন্তর ও বাইরে সহযোগিতার সম্পর্ক প্রসারকল্পে এবং আসিয়ানের সদস্যবর্গের অব্যাহত উন্নয়নের নিশ্চয়তা বিধান কল্পে আসিয়ান তার সদস্য নয় এমন দেশগুলির সঙ্গে চার ধরনের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেঃ ''সংলাপ সঙ্গী'' (কতিপয় দেশ ও জোটের সঙ্গে), ''পরামর্শ সঙ্গী'' (কিছু কিছু দেশের সঙ্গে), কিছু দেশকে ''পর্যবেক্ষকের মর্যাদা প্রদান, এবং পরিশেষে খাত অনুযায়ী কিছু দেশের সঙ্গে সংলাপ সঙ্গী সর্ম্পক স্থাপন।[৮] এ ধরনের সম্পর্ক সর্বদা পর্যালোচনার অপেক্ষায় থাকে এবং পর্যালোচনার প্রতি বছর সম্পর্কের ক্ষেত্রে পদমর্যাদার উন্নয়ন ঘটে। দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা চলে যে, ১৯৯৩ সন থেকে

১৯৯৬ সন অবধি একটি খাত ভিত্তিক সংলাপ সঙ্গী হিসেবে আসিয়ানের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার পর ভারত বর্তমানে পূর্নাঙ্গ 'পরামর্শ সঙ্গীর' মর্যাদা লাভ করে।[১০]

একই সঙ্গে, আসিয়ান তার আঞ্চলিক কর্মকান্ডের পরিধি সম্প্রসারিত করে। এটা প্রতিফলিত হয় বৃহত্তর অঞ্চল ব্যাপী অধিকতর সম্প্রসারিত অর্থনৈতিক সংগঠন 'এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগর অর্থনৈতিক সহযোগিতা' (Asia-Pacific Economic Cooperation - APEC) সৃষ্টিতে। একই ধরনের আরো প্রয়াস প্রতিফলিত হয় আসিয়ানের উদ্যোগে নিরাপত্তা সংলাপের জন্য গঠিত তথাকথিত আসিয়ান আঞ্চলিক ফোরাম (ASEAN Regional Forum-ARF) এর কর্মকান্ডে। এ সংগঠনে এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল ছাড়াও বাহিরে থেকে ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ মোট ১৮টি দেশ বা সংস্থাকে সদস্য পদ প্রদান করে। এ দু'সংস্থার কর্মকান্ডের প্রক্রিয়ার আসিয়ান তার স্বার্থের পরিধি বৃদ্ধি করে। প্রথম সংগঠনটির মাধ্যমে আসিয়ান বৃহত্তর এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সঙ্গে একযোগে ১৯৯৪ সনে ইন্দোনেশিয়ার বগোরে গৃহীত ঘোষণার আদর্শ ও উদ্দেশ্যাবলী অর্জনে ব্যবহৃত হয়। ঐ ঘোষণার মূল লক্ষ্য ছিল এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে অধিকতর বাণিজ্য উদারনীতিকরণ। পক্ষান্তরে, দ্বিতীয় সংগঠনটি মুখ্যত নিরাপত্তা বিষয়ক সংলাপ বা আলাপ আলোচনায় নিয়োজিত থাকে এবং এক্ষেত্রে লক্ষ্য হচ্ছে স্বচ্ছতা ও সমঝোতার মাধ্যমে শান্তি বা স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করা ।[১১] এসব ক্ষেত্রে আসিয়ানের উদ্যোগ অনুকরণীয়।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আন্ত:আঞ্চলিক বা আসিয়ানের অভ্যন্তরে উপ-আঞ্চলিক ব্যবস্থা হচ্ছে আসিয়ান দেশসমূহের আরেকটি তাৎপর্যপূর্ন উদ্যোগ। এ উদ্যোগ আপেক্ষিকভাবে সাম্প্রতিককালীন। এর অধিকতর পরিচিতি হচ্ছে "উন্নয়ন ত্রিভূজ" নামে। এ ধারণা রাতারাতি গড়ে ওঠেনি এবং বিভিন্ন সময়ে বিশ্লেষকেরা এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করেন। কেউ একে "প্রাকৃতিক অর্থনৈতিক সীমানা বলে অভিহিত করেন, কেউ একে মনে করেন "আন্ত: জাতীয় অর্থনৈতিক এলাকা" বা লন্ডন ভিত্তিক 'দ্য ইকনমিষ্ট' এর ভাষায় একে "প্রাকৃতিক অর্থনৈতিক জোন" ও বলা চলে।[১২]

প্রকৃত অর্থে "উন্নয়ন ত্রিভুজ" হচ্ছে আঞ্চলিকতার স্থানীয় প্রতিরূপ ব্যবস্থা বিশেষ। প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন উদ্দেশ্যাবলী ও পদ্ধতির দিক থেকে এর পরিধি আপেক্ষিক ভাবে সীমিত। আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে একে নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষা ক্ষেত্রও বলা চলে, এমনকি আঞ্চলিক উন্নয়ন নীতি-কৌশলের ক্ষেত্রে একে নতুন দৃষ্টিকোণ হিসাবেও উপস্থাপন করা হয়ে থাকে।[১৩]

"উন্নয়ন ত্রিভূজ" পরিকল্পনা অনুযায়ী তিন বা সম্ভবত ততোধিক সদস্য দেশের ভৌগোলিকভাবে ঘনিষ্ঠ এলাকাগুলো একে অপরের পরিপূরক হয়ে তাদের পারস্পরিক অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিকল্পে ঐক্যবদ্ধ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। দক্ষিন পূর্ব এশিয়ায় এ ধরনের পাঁচটি "উন্নয়ন ত্রিভূজ" এর নাম উল্লেখ করা চলে। এর মধ্যে সবচেয়ে পুরনো উদ্যোগ হচ্ছে "দক্ষিনাঞ্চলীয় উন্নয়ন ত্রিভূজ"। এটিতে ইন্দোনেশিয়ার রিউ প্রদেশ, মালয়েশিয়ার জাহুর রাষ্ট্র ও সিঙ্গাপুর জড়িত। উন্নয়ন প্রয়াসে অপেক্ষাকৃত ভাবে এ ত্রিভূজ-ই অধিকতর সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। দ্বিতীয় হচ্ছে "উত্তরাঞ্চলীয় উন্নয়ন ত্রিভূজ"। এতে সুমাত্রার উত্তরাঞ্চলের এক পাশের সঙ্গে মালয়েশীয় উপদ্বীপের উত্তরাঞ্চল ও থাইল্যান্ডের দক্ষিনাঞ্চল সংযুক্ত করা হয়। কিন্তু এ উপ-আঞ্চলিক প্রকল্প অংশত থাইল্যান্ড ও ইন্দোনেশিয়ার বিদ্রোহী তৎপরতার বিঘ্নিত হচ্ছে এবং অংশত এর কম সাফল্যের জন্য দায়ী করা হয় থাইল্যান্ডের দক্ষিণাঞ্চলীয় সমুদ্র উপকূল ভাগস্থ প্রকল্পের উন্নয়নের দিকে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ। দক্ষিন-পূর্ব এশিয়ার তৃতীয় উন্নয়ন ত্রিভূজ হচ্ছে পূর্ব আসিয়ান উন্নয়ন এলাকা 'ইয়াগা' (East ASEAN Growth Area -EAGA)। এ প্রকল্পে অংশ গ্রহনে প্রত্যাশীদের মধ্যে রয়েছে ফিলিপাইনের দক্ষিনাঞ্চল, ইন্দোনেশিয়ার সুলাবেসী ও মালোকু দ্বীপ, পূর্ব মালয়েশীয় অংগরাজ্য সাবাহ ও সারাওয়াক এবং সুলতানী রাষ্ট্র ব্রুনাই। 'এপেক' অবকাঠামোগত ফোরাম এর উদ্যোগে ইতিমধ্যে 'ইয়াগার' অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য বেসরকারী খাতে টেন্ডার আহবান করা হয়েছে।[১৫] লক্ষনীয় যে, উপর্যুক্ত বিভিন্ন উন্নয়ন ত্রিভূজের সাফল্য বা সীমাবদ্ধতা বিভিন্ন ধরনের, প্রতিটি ক্ষেত্রে রয়েছে অবস্থানগত মাপকাঠি এবং সেই মাপকাঠিতেই সাফল্য বা ব্যর্থতা বিচার্য্য।

দক্ষিন এশীয় উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা

এবার দক্ষিন এশীয় উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার প্রসঙ্গে আসা যাক। দক্ষিন এশিয়ার কিছু কিছু দেশে দৃঢ় প্রত্যয় রয়েছে যে, এ অঞ্চলেও আসিয়ানের অনুকরণে উপ-আঞ্চলিক পর্যায়ে সহযোগিতা তাদের উন্নয়নের অনুকূল হবে। বেসরকারী পর্যায়ে দক্ষিণ এশিয়ায় কিছু কিছু বেসরকারী সংস্থা (এন.জি.ও) আন্তর্জাতিক আর্থিক সাহায্য নিয়ে বিগত অর্ধযুগকালীন সময় তিনটি দক্ষিন এশীয় দেশ বাংলাদেশ, নেপাল ও ভারতের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা বৃদ্ধিকল্পে কাজ করে আসছে। এসব বেসরকারী সংস্থার মধ্যে রয়েছে ঢাকা ভিত্তিক 'বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ' ও 'সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ', নয়াদিল্লীর 'সেন্টার ফর পলিসি রিসার্চ' এবং নেপালে অবস্থিত 'ইনষ্টিটিউট ফর ইন্টেগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট

স্ট্যাডিজ'। এ সংগঠন সমূহ উপ-আঞ্চলিক পর্যায়ে উন্নয়ন সহযোগিতা সম্পর্কিত নিজ নিজ ধারণা সম্প্রসারণ কল্পে জ্ঞান-গবেষণা ভিত্তিক অভিযান চালিয়ে আসছিলো। এ অভিযানের সূত্রপাত ঘটে তাদের আদর্শবাদী চিন্তা-চেতনা থেকে। তারা মনে করে যে পূর্বাঞ্চলীয় দক্ষিন এশিয়ায় পানির প্রাচুর্য্য ও প্রাকৃতিক সম্পদের দিক থেকে সম্পদশালী হওয়া সত্ত্বেও দারিদ্র নিষ্পিষ্ট, ক্ষুধা ও অপুষ্টির অভিশাপে ভুগে চলছে। তাদের বক্তব্য উপস্থাপনকল্পে এসব সংস্থা বেশ কিছু সম্মেলন, কর্মশিবির, সেমিনার, অনুসন্ধান ও গবেষণাকর্মের মাধ্যমে অঞ্চলব্যাপী জনমত সমাবেশ করতে প্রয়াসী হয় যাতে পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা ও পানি সম্পদের উন্নয়নে এ উপ-অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলোকে অধিকতর তৎপর করা যায়। প্রকৃতপক্ষে এ উপ-অঞ্চলে প্রবহমান নদনদী এদের নিকট ''আশা'' ও ''জীবনের'' উৎস বলে বিবেচিত হয়।[১৫]

এ প্রসঙ্গে এও বলা সমীচীন যে, ১৯৯৬ সনে বাংলাদেশে রাজনৈতিক পট পরির্বতনের পর উপর্যুক্ত সংস্থাসমূহের আন্দোলনে নতুন গতি সঞ্চার হয়। কেননা এসময় থেকে এ উপ-অঞ্চলে উন্নয়ন চতুর্ভুজ গঠন অবধি এসব সংস্থাসমূহ ঢাকা, নয়াদিল্লী ও কাঠমুন্ডুতে কয়েকটি সেমিনার সম্মেলন আয়োজন করে।[১৬] যে বিষয়টি স্পষ্ট নয় তাহলো : উপ-অঞ্চলভূক্ত প্রতিটি দেশের অভ্যন্তরে জাতীয় স্বার্থ বিষয় সম্পর্কিত প্রত্যক্ষ অনুভূতির ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত বিভাজন, বিশেষ করে সরকারের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যাবলী নিয়ে বিতর্ক দেখা দিলে বা নীতিগত অগ্রগণ্য বিষয় নিয়ে প্রশ্নের উদ্রেক হলে উপ-আঞ্চলিক জোট সৃষ্টিতে উৎসাহী এসব বেসরকারী সংস্থাসমূহের প্রকৃত অবস্থান কি হবে? তারাও কি বিস্ফোরণমূলক রাজনৈতিক মেরুকরণে জড়িয়ে পড়বে না ?

'দক্ষিন এশীয় উন্নয়ন চতুর্ভূজ' সংস্থার প্রস্তাব উত্থাপণ ও রাজনৈতিক উত্তাপ

প্রকৃতপক্ষে, বাংলাদেশসহ দক্ষিন এশিয়ার কয়েকটি দেশে উন্নয়ন চতুর্ভূজ জোট গঠন সম্পর্কে বেশ সংশয় দেখা দেয়, এমনকি বাংলাদেশের অভ্যন্তর রাজনীতিতে দারুণ উত্তাপ সৃষ্টি হয়। ১৯৯৬ সনের শেষপাদে সরকারী পর্যায়ে দক্ষিন এশিয়ার কতিপয় দেশের রাজধানীতে, বিশেষ করে ঢাকায় উপ-আঞ্চলিক জোট পরিকল্পনার সপক্ষে জোরসোর প্রচারণা চালানো হয়। এ প্রচারণা কালে ঢাকায় এ ধরনের এ ধারণা দেওয়া হয় যে, বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদই ১৯৯৬ সনের ডিসেম্বরে নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত সার্ক পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের সম্মেলনে উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার ধারণা উত্থাপন করেন। প্রকৃত কাহিনী কিছুটা ভিন্নরূপ। উপর্যুক্ত সম্মেলনের কিছুকাল পূর্বে ভারতের তৎকালীন পররাষ্ট্র মন্ত্রী ইন্দর কুমার

গুজরাল, যিনি পরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন, প্রথম বারের মতো বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল ও ভূটানের সহযোগে "একটি গতিশীল উন্নয়ন এলাকা" সৃষ্টির বিষয় উল্লেখ করেন।[১১] পরে ১৯৯৬ সনের সেপ্টেম্বরে তিনি লন্ডনে অবস্থিত "রয়্যাল ইনষ্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল এফেয়ার্স" এ বক্তৃতা প্রদানকালে দক্ষিন এশিয়ায় একটি উপ-আঞ্চলিক জোট গঠনের বিষয়ে ভারতের সংকল্পের বিষয় পুনর্ব্যক্ত করেন।[১২]

উপ-আঞ্চলিক জোট গঠন সম্পর্কিত পরবর্তী ঘটনাবলী এখন আর অবিদিত নয়। বাংলাদেশ ও নেপালের পররাষ্ট্র সচিবদ্বয় ১৯৯৭ সনের মার্চে দৃশ্যত নিজ নিজ দেশের পক্ষ থেকে কাঠমুন্ডুতে সার্ক স্ট্যান্ডিং কমিটির সভায় "ধারণাপত্র" ("কনসেপ্ট পেপার") এবং "প্রস্তবনা পত্র" (বা "এপ্রোচ পেপার") উপস্থাপন করেন। স্ট্যান্ডিং কমিটির ঐ সভা ছিল মালে'য় অনুষ্ঠিতব্য সার্ক শীর্ষ সম্মেলনের প্রস্তুতি পর্বের অংশ-বিশেষ, কিন্তু শীর্ষ সম্মেলনের প্রাক্কালে অনুষ্ঠিত সার্ক পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের সমঝোতা সারমর্মে উপ-আঞ্চলিক জোটের বিষয় পাকিস্তানের আপত্তির কারণে অন্তর্ভূক্ত হতে পারেনি।[১৩]

ইতিমধ্যে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক উপ-আঞ্চলিক জোট এবং এ জোটের ক্ষেত্রে ভারতের ভূমিকা প্রভৃতি বিষয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে বেশ উত্তাপ সৃষ্টি হয়। ১৯৯৭ সনের জানুয়ারির প্রথমার্ধে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী দেবগৌড় বাংলাদেশ সফরে আসেন। এই সফরকালে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জনসভায় এবং সাংবাদিক সম্মেলনে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহুমুখী সম্ভাবনাময় সহযোগিতার বিশদ দিক তুলে ধরতে প্রয়াসী হন। দু'দেশের সম্পর্ককে তিনি "ঘনিষ্টতম বন্ধুপ্রতীক প্রতিবেশী" সম্পর্ক বলে অভিহিত করেন। "প্রকৃত বন্ধু" হিসেবে দু'দেশের রাজনৈতিক প্রত্যয় ও সংকল্পের সমন্বয় করে তিনি অর্থনৈতিক উন্নয়ন কল্পে সুযোগ সৃষ্টির উপর জোর দেন, বাংলাদেশ এবং সীমান্ত সংলগ্ন ভারতীয় রাজ্যগুলোর সঙ্গে ব্যবসায়িক সুযোগ সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক যোগাযোগ স্থাপনের ওপরও গুরুত্ব প্রদান করেন। তদুপরি, তিনি এশীয় হাইওয়ে ও এশীয় রেলওয়ে পরিকল্পনাধীন ব্যবস্থায় আঞ্চলিক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপন সম্পর্কিত প্রস্তাবের প্রতি সর্মথন প্রদান করেন। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ভারতের সঙ্গে একযোগে কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন যাতে "আমাদের অঞ্চলের দেশগুলো উপ-আঞ্চলিক প্রক্রিয়ায় দ্রুততর উন্নয়নের পথে ধাবিত হতে পারে"। তাঁর প্রস্তাবিত এই উপ-আঞ্চলিক উন্নয়ন দৃষ্টিকোণে তিনি "বাংলাদেশ নেপাল, ভূটান এবং আমাদের দেশ সংলগ্ন ভারতীয় এলাকা সমূহকে" অন্তর্ভূক্ত করেন। কেননা তাঁর দৃষ্টিকোণ থেকে এই উপ-অঞ্চলের জনমানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসা-বাণিজ্য, বিষয় যেমন,

বিদ্যুতের উৎপাদন ও বিতরণ এবং প্রয়োজন অনুযায়ী অধিকতর বিদ্যুৎ শক্তি আহরণসহ এখানকার সুবিশাল প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকতর সুদক্ষ ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে সুফল ও অর্থবহ সহযোগিতা কল্পে অবিলম্বে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব হবে।

বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রীর এ ধরনের বক্তব্য ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যেও প্রতিধ্বনিত হয়। তিনিও উন্নততর যোগাযোগ ব্যবস্থা ট্রানজিট বা সীমান্ত। সংযোগপথ রাজপথ ও রেলপথ সড়ক প্রভৃতি সহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির কথা বলেন।[২০] পরবর্তীকালেও শেখ হাসিনা উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার প্রতি সুস্পষ্ট সমর্থন প্রদান করেন, কেননা তিনি এ ধরনের সহযোগিতা সার্ক সনদের ৭নং ধারার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে করেন, যার ফলে সার্ক সুসংহত হবে এবং বিশ্বের বিভিন্ন এলাকায় এ ধরনের সহযোগিতা প্রচলিত রয়েছে বলেও তিনি মন্তব্য করেন।[২১]

জনসভা ও গণমাধ্যম ব্যবহার করে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ সফররত ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে একই সুরে সুর মিলিয়ে যে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় উপ-আঞ্চলিক জোট গঠনের প্রস্তাব রাখেন তার প্রতিক্রিয়া ছিল প্রায় স্বত:স্ফূর্ত ও তাৎক্ষণিক। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠীবিশেষ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এবং জাতীয় সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া। উপ-আঞ্চলিক জোট সম্পর্কিত জনসভা ও গণমাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর উচ্চারিত বক্তব্য ও বিবৃতির পরিপ্রেক্ষিতে তিনি জাতীয় সংসদে তাঁর শাণিত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। তিনি এ দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করেন যে প্রস্তাবিত চার জাতির সমন্বয়ে উপ-আঞ্চলিক জোট গঠন করার উদ্দেশ্য হবে সার্ককে অকার্যকর করা, "ভারতীয় সম্প্রসারণবাদকে প্রতিষ্ঠিত করা।" তিনি এ প্রয়াসকে দেখেন "সার্কের চেতনাকে নস্যাৎ করার চক্রান্ত হিসেবে" এবং সার্ককে সম্পূর্ণ ধ্বংস করার একক পরিকল্পনা হিসেবে। তিনি প্রশ্ন রাখেন, বাদবাকী তিনটি সার্কভূক্ত দেশকে কেন বাদ দেয়া হয়েছে ? তাঁর মতে, এর কারণ হচ্ছে ভারত শেষ অবধি প্রস্তাবিত উপ-আঞ্চলিক জোটভুক্ত তিনটি দেশকে ভারতের অন্তর্ভূক্ত প্রদেশে রূপান্তরিত করবে। তাঁর ভাষায়, "ভারতের অংশবিশেষকে উপ-আঞ্চলিক জোটে টানার অর্থ হচ্ছে প্রস্তাবিত জোটের জন্য তিনটি দেশের সার্বভৌমত্বকে কার্যত নাকচ করে দেয়া, ভারতের অংগরাজ্য হিসেবে তাদের দেখা। আমাদের সরকার ভারতকে তার অশুভ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে মদদ যোগাচ্ছে।" খালেদা জিয়া আরো অভিযোগ করেন যে, বাংলাদেশের আওয়ামী লীগ সরকার "এশিয়ান হাইওয়ের" নামে ভারতকে 'করিডোর' দেওয়ার পরিকল্পনা করছে এবং তিনি মনে করেন যে নয়াদিল্লী

পরিকল্পিত করিডোরের ব্যবহার করবে সৈন্য পাচার বা চলাচলের কাজে।[২২] এসব বহুবিধ কারণ দেখিয়ে তিনি উপ-আঞ্চলিক জোট গঠনের সকল প্রচেষ্টা প্রতিরোধ করার আহবান জানান। তিনি স্বয়ং "বাংলাদেশকে ভারতের একটি প্রদেশে পরিনগণিত করার পরিকল্পনা নস্যাৎ করার" দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।[২৩] স্পষ্টতই বাংলাদেশের বিরোধী দলীয় নেত্রী প্রস্তাবিত উপ-আঞ্চলিক জোটকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি হিসেবে দেখেন।

এভাবে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে উপ-আঞ্চলিক জোট গঠনের প্রস্তাবনার ধরন ও প্রক্রিয়া এবং সংসদে বিরোধী দলের শাণিত প্রতিক্রিয়ার ফলে এ বিষয়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে দারুন উত্তাপ ও উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। অথচ এধরনের জাতীয় ও আঞ্চলিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে প্রয়োজন সহযোগিতা এবং সমাজের সকল শ্রেণীর মধ্যে সমঝোতা ও সম্প্রীতি। ফলে পরিকল্পিত উপ-আঞ্চলিক জোটের সাফল্যের অনুকূলে শুভ সূচনার ভাব পরিলক্ষিত হয়নি। বরং উপ-আঞ্চলিক জোট প্রস্তাবকদের পক্ষ থেকে শান্তি ও উন্নয়নের সপক্ষে সংশ্লিষ্ট মতামতসমূহকে বশে আনার ক্ষেত্রে অপরিপক্কতার পরিচয় পাওয়া যায়।

উন্নয়ন ত্রিভূজ বনাম উন্নয়ন চর্তুভূজ

বিতর্ক দেখা দেয় আরেক পর্যায়েও। প্রশ্ন আসে, উপ-আঞ্চলিক জোটে আন্তর্জাতিক সাহায্য-সহগোগিতা, বিশেষ করে দু'টি আন্তর্জাতিক আর্থিক সংগঠন বিশ্বব্যাংক ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক-এর ভূমিকা কি ধরনের হবে? দৃশ্যত বিশ্বব্যাংক আসিয়ানের উন্নয়ন ত্রিভূজের অভিজ্ঞতার অভিভূত হয়ে দক্ষিন এশিয়ায়ও একই ধরনের সহযোগিতামূলক প্রকল্পে সাহায্য প্রদানে উৎসাহী হয়। প্রকৃত পক্ষে, বিশ্বব্যাংক-এর পক্ষ থেকে "দক্ষিন এশীয় উন্নয়ন ত্রিভূজ" নামক একটি অববাহিকা ভিত্তিক উন্নয়ন প্রকল্প উন্মোচন করা হয়। উদ্দেশ্য হচ্ছে, গঙ্গা-ব্রম্মপুত্র-মেঘনা অববাহিকার বেশ কিছু এলাকা জুড়ে একটি আন্ত:সীমানা উন্নয়নমূলক সহযোগিতার ভিত গড়ে তোলা। এ প্রকল্পে থাকবে ভারতের পূর্বাঞ্চল ও উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় এলাকা সমূহ, বাংলাদেশ, নেপাল ও ভূটান।

বিশ্বব্যাংকের পরিকল্পিত উন্নয়নমূলক উদ্যোগকে দেখা হয় সার্ক কাঠামোর ভেতরে। তার চেয়েও বড় কথা, বিশ্বব্যাংকের পরিকল্পিত উন্নয়ন ত্রিভূজকে কৌশলগত ভাবে বঙ্গোপসাগরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ উপ-অঞ্চল হিসাবে দেখা হয়, যে উপ-অঞ্চল কালে পূর্ব ও দক্ষিন পূর্ব এশিয়া, মধ্য এশিয়া ও পশ্চিম ইউরোপীয়, দেশগুলোর সঙ্গে সুবিধাজনক যোগসূত্র বা বন্ধন হিসাবে কাজ করতে

পারে। এভাবে বিশ্বব্যাংকের পরিকল্পনায় রয়েছে একটি বিশদ রুপরেখা, উন্নয়নের দিক থেকে এতে রয়েছে একটি বৈশ্বিক দৃষ্টিকোণ; উদ্দেশ্য হচ্ছে বিশ্বব্যাংক-এর বর্তমান সাহায্য কর্মসূচীর পরিপূরক হিসেবে উন্নয়ন তৎপরতা জোরদার করা এবং বৃহত্তর অঞ্চলব্যাপী উন্নয়ন সম্পর্কিত সুযোগ বৃদ্ধিকল্পে সচেতনতা সৃষ্টি করা। সঙ্গতিপুর্ণ কৌশলগত বিনিয়োগ পরিকল্পনা, সহায়ক নীতিগত পদক্ষেপ এবং রাষ্ট্রীয় সীমারেখার উর্ধ্বে বিভিন্ন দেশে স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়নের ক্ষেত্রে অধিকতর উদ্যম সৃষ্টি সহ এসকল কিছুর সমন্বয় বিধান ছিল বিশ্বব্যাংকের সার্বিক লক্ষ্য।[২৪]

বিশ্বব্যাংক ছাড়া এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকও দক্ষিন এশীয় উপ-আঞ্চলিক উন্নয়নে আগ্রহ প্রদর্শন করে। দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিতর্কে না জড়িয়ে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকও উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতাকে ইতিবাচক আলোকে দেখে, ব্যাংক-এর পক্ষ থেকে বিশেজ্ঞ ও আর্থিক সাহায্য প্রদানের প্রস্তাব রাখে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এও মনে করে যে, এই উপ-আঞ্চলে কার্যকর সহযোগিতার সুফল হবে কল্পনাতীত। এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয় জলবিদ্যুৎ ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের ফলে দেখা দেবে সহযোগিতার প্রচুর সম্ভাবনা।[২৫]

বাংলাদেশের ''যুগপৎ উপ-আঞ্চলিক উদ্দ্যোগ''

অবশ্য এও মনে রাখা প্রয়োজন যে, দক্ষিন এশীয় উন্নয়ন চতুর্ভূজ বাংলাদেশের উদ্যোগে গঠিত একমাত্র উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা সংগঠন নয় যার সঙ্গে বাংলাদেশ সম্পৃক্ত হয়। প্রায় একই সময়ে ঢাকা যুগপৎভাবে কয়েকটি উপ-আঞ্চলিক আঞ্চলিক জোটে আগ্রহী হয়, এমনকি উদ্যোগী ভূমিকাও পালন করে। বাংলাদেশ সরকারের দৃষ্টিকোণ থেকে, এসব যুগপৎ উদ্যোগের ফলে আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা জোরদার হবে, ত্বরান্বিত হবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন। এরূপ দাবি করা হয় যে, ১৯৯৭ সনে মালে অনুষ্ঠিত সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাস্তবজ্ঞান ভিত্তিক ভূমিকার ফলে সার্কের মাধ্যমে আঞ্চলিক সহযোগিতার প্রয়াসে নতুন গতি সঞ্চার হয়। সরকারের পক্ষ থেকে আরো দাবি করা হয় যে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্র আরো প্রসারিত হয়েছে অন্য দু'টি সংস্থায় বাংলাদেশের যোগদানের ফলে। এর একটি হচ্ছে বিস্টেক (BISTEC - Bangladesh, India, Sri Lanka and Thailand Economic Cooperation)। মায়ানমার বা বার্মা এতে প্রথমে পর্যবেক্ষক হিসেবে যোগদান করে এবং পরে সেদেশ পূর্ণ সদস্য পদও গ্রহণ করে। ফলে বিস্টেক রূপান্তরিত হয় বিমষ্টেক- এ (BIMSTEC)। দ্বিতীয় আরেকটি সংস্থার সদস্যপদও বাংলাদেশ কয়েকমাসের ব্যবধানে লাভ করে এটি ডি- ৮ বা আটটি উন্নয়নকামী দেশের সংস্থা (Developing-Eight)। এর

মাধ্যমে বাংলাদেশ মিশর, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, মালয়েশিয়া, নাইজেরিয়া, পাকিস্তান, ও তুরস্কের সঙ্গে সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক জোরদার কল্পে জোটভূক্ত হয়। বাংলাদেশ তার উন্নয়নের কূটনীতি এ পর্যায়েও ক্ষান্ত করেনি। সরকারের পক্ষ থেকে এমন দাবিও করা হয় যে, বাংলাদেশ জোরে সোরে চেষ্টা করে চলছে যাতে প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে দ্বি-পাক্ষিক ও উপ-আঞ্চলিক পর্যায়ে সম্পর্ক জোরদার হয়, বিশেষ করে ব্যবসা-বাণিজ্য, বিনিয়োগ, ট্রানজিট ও পর্যটন সম্পর্ক সম্প্রসারিত হয়।

বাংলাদেশ সরকারের প্রত্যাশা যে, উপ-অঞ্চল, দ্বি-পাক্ষিক ও আঞ্চলিক পর্যায়ে সম্পর্ক জোরদার কল্পে গৃহীত এসব বহুবিধ উদ্যোগের ফলে "দেশের অর্থনীতিতে দারুণ ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। বিশ্ব অর্থনীতিতে আন্তর্জাতিকীকরণের পটভূমিতে আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক পর্যায়ে দ্রুত আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকল্পে সুযোগ সুবিধা ছিনিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পিছিয়ে থাকতে পারে না"।[২৫] এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ্য যে, উপর্যুক্ত বহুবিধ পর্যায়ের সম্পর্ক স্থাপন ছাড়াও বাংলাদেশ ভারত মহাসাগর প্রান্তস্থ আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থায় (Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation-IORARC) যোগদানেও বেশ আগ্রহী। বস্তুত, নয়াদিল্লী ও ঢাকায় এখন পারস্পরিক ভাবে বন্ধুপ্রতিম সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার ফলে এ সংস্থায় বাংলাদেশের যোগদানের সম্ভাবনাও উজ্জলতর হয়েছে। ভারতে সরকার পরিবর্তনে ঢাকা নয়াদিল্লী সম্পর্কে ভাটা পড়েনি; বরং বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী দ্রুত ভারত সফর করে দু'দেশের সুসম্পর্ক বহাল রাখতে প্রয়াসী হন।

বিশ্লেষণী দৃষ্টিকোণে মতানৈক্য

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বেশ কিছুকাল থেকে বাংলাদেশ সরকারের অব্যাহত বক্তব্য ছিল যে বাংলাদেশের উদ্যোগে গঠিত যে কোন উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা হবে সার্কের কাঠামোর অধীন; কিন্তু সংশ্লিষ্ট চারটি দেশের পররাষ্ট্র সচিবদের ১৯৯৭-এর মার্চে অনুষ্ঠিত সভায় নতুন উপ-আঞ্চলিক জোটের নাম দেয়া হয়, "দক্ষিন এশীয় উন্নয়ন চতুর্ভূজ" (South Asian Growth Quadrangle বা SAGQ)। তদুপরি, নতুন উপ-আঞ্চলিক উদ্যোগ সার্ক-এর বহির্ভূত বলেও বিবেচিত হয়।

ইতিমধ্যে, একদিকে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর পক্ষ থেকে উপ-আঞ্চলিক জোটের সম্ভাব্য সহযোগিতার খাত সমূহ চিহ্নিত হয়, অন্যদিকে বিষয়টিকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে দেখা দেয় বড় ধরনের স্পষ্ট মতপার্থক্য। দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে

পরিলক্ষিত মতভেদ প্রভাব ফেলে সমাজের সর্বত্র। এমনকি বড় ধরনের মেরুকরণ পরিলক্ষিত হয় বিশ্লেষণী দৃষ্টিকোণে। বিশ্লেষকদের এক শ্রেণী সরকারী অবস্থানের অনুকূলে বক্তব্য রাখেন।[২৭] অনেকে আপত্তি তোলেন, কেননা তাঁদের বড় ভয় হয় যে, 'দক্ষিন এশীয় উন্নয়ন চর্তুভূজ' এ অঞ্চলের বৃহৎ শক্তি ভারত কর্তৃক পরিকল্পিত তার নিজ স্বার্থ সিদ্ধির একটি চালমাত্র। এ দৃষ্টিকোণ থেকে, ভারতের উদ্দেশ্য হচ্ছে সার্কের প্রতিসাম্য চেতনা নস্যাৎ করা। বাংলাদেশসহ জোটভূক্ত দুর্বলতর দেশগুলোকে ভারতের মার্জিনীকরণ প্রক্রিয়ায় নিয়ে আসা এবং এ প্রক্রিয়ায় ভারতের জাতীয় স্বার্থজনিত কার্যসূচী উদ্ধার করা। উন্নয়ন চতুর্ভূজকে এভাবে দেখা হয় বাংলাদেশের অভ্যন্তরভাগ দিয়ে ট্রানজিট/করিডোর লাভের "মুখোশ" হিসাবে, কেননা ভারতের উত্তর-পূর্ব রাজ্যসমূহের বিদ্রোহ দমনে এ ধরনের সুযোগ লাভে ভারত মরিয়া হয়ে রয়েছে; ভারত, এ মতে, আরো চাচ্ছে চট্টগ্রাম নৌবন্দরে অনুপ্রবেশ লাভের সুযোগ। এই প্রক্রিয়ায় নেপাল ও ভূটান হয়তো 'প্রক্সি' হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে, কিন্তু বাংলাদেশকে এ অঞ্চলের অভিন্ন সেবায় নিজস্ব ভূ-প্রাকৃতিক কৌশলগত অবস্থানকে সমর্পন করতে হবে, আর বিনিময়ে বাংলাদেশ পাবে সেই দূরভবিষ্যতে তুচ্ছ স্বার্থলাভের অঙ্গীকার মাত্র।[২৮]

দক্ষিন এশীয় উন্নয়ন চতুর্ভূজ উদ্বোধনের পাশাপাশি এই অন্ত:আঞ্চলিক পরিকল্পনা নিয়ে সার্কদেশসমূহে এ নতুন সংস্থার প্রয়োজনীয়তা, প্রাসঙ্গিকতা, এমনকি সার্কের প্রতিলিপিকরণ বা পাল্টা-ব্যবস্থা হিসেবে একে দাঁড় করানো হয়েছে কিনা এ নিয়ে উত্তরোত্তর সংশয় দেখা দেয়। বিশ্বব্যাংক দক্ষিন এশীয় উন্নয়ন ত্রিভূজ-এর প্রস্তাব রাখতে গিয়ে সম্ভাবত আসিয়ান-এর উন্নয়ন অভিজ্ঞতার অনুকরনের বিষয় ভেবেছিলো, কিন্তু দক্ষিন এশীয় উন্নয়ন সংস্থায় আগ্রহী প্রস্তাবকেরা ভিন্নতর নাম বেছে নেয়।

প্রাসঙ্গিক প্রশ্নমালা

দৃশ্যত দক্ষিন এশীয় উন্নয়ন চতুর্ভূজের উদ্বোধনে সংশ্লিষ্ট দেশের নিজ নিজ আমলাতান্ত্রিক পরিকাঠামো মুখ্য ভূমিকা পালন করে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে উপ-আঞ্চলিক জোটের উদ্বোধন প্রাক্কালে সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় ও পরিলক্ষিত আচরণ থেকে এ সম্পর্কিত উত্তর প্রদানের চেয়ে প্রশ্নের উদ্রেক করে অধিকতর। এ প্রসঙ্গে স্বাভাবিকভাবে যেসব প্রশ্নের উদ্রেক হয় সেসবের মধ্যে রয়েছে অনেক ধরনের জিজ্ঞাসা, যেমন: উন্নয়ন চতুর্ভূজে অংশগ্রহণকারী চারটি দেশ নতুন সংস্থার উদ্বোধন করতে গিয়ে কি কি ধরনের দিক-নির্দেশনা ও উদ্দেশ্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় ? এ ক্ষেত্রে প্রত্যাক্ষ অনুভূতি ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি কি কি ? কি ধরনের সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ার যোগসাজশে নতুন উপ–আঞ্চলিক সংস্থা জন্ম লাভ করে ? এ ধরনের

গুরুত্বপূর্ন একটি আধিজাতিক সংস্থার উদ্বোধনের পূর্বভাগে প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি নিয়ে জাতীয় নীতি-নির্ধারকবৃন্দ কি ধরনের বিতর্ক বা আলাপ-আলোচনার প্রবৃত্ত হন ? বিশ্বব্যাংক ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এর মতো বহুপাক্ষিক আর্থিক সংগঠনগুলো উন্নয়ন চতুর্ভূজের বাস্তবায়নে কি ধরনের অবদান রাখতে আগ্রহী? বহুপাক্ষিক সংগঠনসমূহের সাহায্য-সহায়তার বিষয়ে এবং কি প্রক্রিয়ায় এসব সংস্থা জড়াবে এসব সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সরকার সমূহের অবস্থান কি ধরনের? আসিয়ানের উন্নয়ন ত্রিভূজসহ বিশ্বের অন্যান্য উন্নয়ন মডেলসমূহের অভিজ্ঞতার যথাযথ পর্যালোচনা বা মূল্যায়নের পর কি দক্ষিণ এশিয়ায় একই ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে? অন্যান্য সার্কভুক্ত দেশগুলোকে কেন দক্ষিণ এশিয়ার এই নতুন উন্নয়ন সংস্থার যোগ দেয়ার জন্য ডাকা হয়নি বা সার্কভুক্ত নয় অথচ এ ধরনের উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা প্রকল্পে, বিশেষকরে আন্ত: সীমানা জুড়ে সহযোগিতার গভীরভাবে আগ্রহী দেশসমূহ কিভাবে এ উপ-আঞ্চলিক জোটকে দেখছে? আসিয়ানের দক্ষিণাঞ্চলীয় উন্নয়ন ত্রিভুজে অন্তর্ভূক্ত রাষ্ট্রসমূহ যেমন- ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরের সাফল্য থেকে কি ভাবে শিক্ষা গ্রহণ করে এ ধরনের উন্নয়ন প্রক্রিয়া থেকে লাভবান হওয়া প্রকৃত অর্থে যেতে পারে?

এ ধরনের প্রশ্নমালা নতুন একটি উন্নয়ন উদ্যোগ সম্পর্কে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। এমনকি উন্নয়ন চতুর্ভূজ যথার্থ-ই পারস্পরিক স্বার্থের উন্নয়নে প্রায়োগ করতে হলে এসব প্রশ্নের উত্তর খতিয়ে দেখতে হবে, শিখতে হবে অন্যদের জ্ঞান-অভিজ্ঞতা থেকে। বাংলাদেশের মতো একটি দারিদ্রক্লিষ্ট দেশের বিশেষজ্ঞ ও বুদ্ধিজীবীদের এধরনের কল্পিত উন্নয়ন কাঠামো সম্পর্কে অতি পুলকিত হবার কোন কারণ রয়েছে বলে মনে হয় না। অন্ত:দৃষ্টি, দূরদৃষ্টি, সমকালীন অভিজ্ঞতা ও দেশের বৃহত্তর স্বার্থ প্রভৃতি দিক বিবেচনা করেই ভাবতে হবে দেশের জন্য, দেখতে হবে দেশের জনগনের ভবিষ্যৎ নিশ্চয়তা প্রদানকল্পে কি করণীয় এবং কোনটি মঙ্গলকর।

এ প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে, উপর্যুক্ত প্রশ্নমালা বা সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ যথার্থ দিক থেকে জাতীয় সংসদে আলোচিত হয়নি, অথচ সরকারের পক্ষ থেকে জাতীয় সংসদকেই বলা হয় "সকল জাতীয় কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দু।" এসব বিষয় সরকারী দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের পর্যায়- এমন কি মন্ত্রী পরিষদ পর্যায়ে আদৌ আলোচিত হয়েছে বলে জানা যায়নি। আলোচনা মতবিনিময় বা ভাবের লেনদেন ছাড়া জাতীয় স্বার্থের স্থায়ী দিক, এমনকি দলীয় স্বার্থও চিহ্নিত করা সম্ভব নয়।

এর চেয়েও বড় কথা, "সুশীল সমাজ"— দেশের সচেতন বৃহত্তর জনগোষ্ঠিকে একেবারে অন্ধকারে রাখা হয় এ বিষয়ে যে দেশের ভৌগোলিক

স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের ক্ষেত্রে কোন ধরনের হুমকি দেখা দেবে কিনা। যে বিষয় এ প্রসঙ্গে সবচেয়ে বেশী মনে রাখার কথা তাহলো, উন্নয়ন বা প্রবৃদ্ধির নামে হলেও একটি বৃহত্তর আধিজাতিক সংস্থা সৃষ্টির অর্থ হবে বড় ধরনের আর্থিক বরাদ্ধ, যদি দেশের সম্পদে তা কুলায়, এবং একই সঙ্গে আরো প্রয়োজন হবে নতুন স্বদেশ বহির্ভূত বা আধিরাষ্ট্রিক নিয়ন্ত্রক সংস্থা সৃষ্টি-যার অর্থ দাঁড়াবে সেই উপ-আঞ্চলিক সংস্থার নিকট আনুগত্য/ সার্বভৌমত্ব হস্তান্তর বা সমর্পন করা। একই ধরনের পরিস্থিতিতে বিশ্বের প্রায় সবদেশেই এরূপ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জাতীয় পর্যায়ে গণভোট বা অন্যুন পক্ষে সংসদে দু-তৃতীয়াংশ ভোটের মাধ্যমে অনুমোদন লাভ করা হয়ে থাকে। অথচ বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে এরূপ প্রক্রিয়া নিছক অপ্রাসঙ্গিক বলে বিবেচিত। অন্যদিকে যে স্বচ্ছতা জাতি গভীর ভাবে কামনা করছে এবং যে গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতার অঙ্গীকার জাতিকে বার বার দেয়া হয়েছিল তা এখন অলীক বলে মনে হয়।

বহুপাক্ষিক আর্থিক সমর্থন

এটা অবিদিত নয় যে, দক্ষিন এশীয় উপ-আঞ্চলিক জোটভূক্ত চারটি দেশের-ই মারাত্মক ধরনের আর্থিক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তাই উপ-আঞ্চলিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পিত বড় ধরনের প্রকল্পের বাস্তবায়নে তাদের নির্ভরশীল হতে হবে দাতা দেশ বা বহুপাক্ষিক দাতা সংস্থাসমূহের সাহায্যের ওপর। এক্ষেত্রে বাস্তবতা অনেক কঠোর। এর কয়েকটি দিক রয়েছে। বৈদেশিক সাহায্য আজকাল বেশ টানাপোড়েন অবস্থায়। তদুপরি, এ উপ-অঞ্চলের দেশগুলো তাদের জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন উন্নয়ন খাতে প্রচন্ডভাবে বিদেশী সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল। বিশেষ করে বাংলাদেশের সম্পর্কে এটা অনেকটা প্রযোজ্য। এমনকি অপেক্ষাকৃত শিল্পোন্নত ভারতও তার অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য বিদেশী-সাহায্য নির্ভরশীল। কিন্তু যেকোন বিদেশী সাহায্যের সঙ্গে যুক্ত হয় দায়বদ্ধতা। ভারত সরকার অনেক ক্ষেত্রে এ কারণে বিদেশী সাহায্যের বিষয়ে স্পর্শকাতর হয়ে দাঁড়ায়।

এছাড়া, দক্ষিন এশীয় উপ-আঞ্চলিক জোট বা প্রস্তাবিত উন্নয়ন চতুর্ভুজ ও বিশ্বব্যাংক এর উত্থাপিত উন্নয়ন ত্রিভূজের মধ্যে ধারণাগত বা দিকদর্শনের ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকার কারণে বহুপাক্ষিক সংস্থাসমূহ আর্থিক সাহায্য প্রদানে এগিয়ে নাও আসতে পারে, বিশেষ করে উন্নয়ন চতুর্ভূজের প্রকল্প যদি তাদের নিজস্ব পরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ন না হয়। এক্ষেত্রে দু'পক্ষের দৃষ্টিকোণ ভিন্নতর হতে বাধ্য। তদুপরি, আঞ্চলিক আধিপত্যে প্রত্যয়ী বৃহৎশক্তি ভারত দাতা সাহায্যে এমনিই আগ্রহী অতি সামান্য। তাছাড়া, ভারতের এটা অজানা নয় যে বিশেষজ্ঞ সমর্থন/ আর্থিক সাহায্য যেকোন ভাবে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার অর্থ হবে

অধিকতর বহুপাক্ষিকতা, স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা এবং এসবের আরো অর্থ দাঁড়াবে আঞ্চলিক ক্ষেত্রে ভারতের একক কর্তৃত্ব ও প্রভাব-প্রতিপত্তি হ্রাস পাওয়া। এসব কারণে বহুপাক্ষিক সাহায্য সহযোগিতা সম্পর্কে ভারত অত্যন্ত সন্দীহান।

উন্নয়ন কূটনীতি ও "ভারত প্রসঙ্গ"

আন্তর্জাতিক সাহায্য-সহযোগিতার প্রতি প্রতিবেশী বৃহৎশক্তি ভারতের এ জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী মনে রেখে উপ-আঞ্চলিক জোট সম্পর্কে নয়াদিল্লীর উদ্দেশ্যাবলীর বিশদ পর্যালোচনার অপেক্ষা রাখে। কেননা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের ধারা এবং নয়াদিল্লী এদেশের সঙ্গে তার নিজস্ব স্বার্থ চরিতার্থতায় যেভাবে সচেষ্ট থাকে তাতে বাংলাদেশে দারুণ ভারত-ভীতি সঞ্চার হয়, প্রশ্নের অবতারণা করা হয় যে ভারতের আসল উদ্দেশ্য কি উপ-আঞ্চলিক উন্নয়নের নামে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশের সুযোগ লাভ এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তর ভাগকে ট্রানজিট হিসাবে ব্যবহার করে ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিদ্রোহ দমনের প্রচেষ্টা চালানো ? দক্ষিন এশিয়ার এই বিদ্রোহ ও বিদ্রোহ দমনের পাল্টা ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আরো মনে রাখা প্রয়োজন যে, আসিয়ানের অধীন থাইল্যান্ডের দক্ষিনের একাংশ ও ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা দ্বীপের উত্তরাংশ নিয়ে গঠিত "উত্তরাঞ্চলীয় উন্নয়ন ত্রিভূজ" এর আপেক্ষিক ব্যর্থতার জন্য ঐসব এলাকার চলমান বিদ্রোহী তৎপরতাকে দায়ী করা হয়। যুক্তির খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া হয় যে, বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার এই পূর্বাঞ্চলে ভারত যথার্থ-ই উন্নয়নমূলক উপ-আঞ্চলিকতা সম্পর্কে সদ্ভাব পোষণ করে এবং এজন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানেও অঙ্গীকারবদ্ধ হয়, তবু ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য সমূহেক্রমবর্ধমান হারে বেড়ে যাওয়া বিদ্রোহ ও পাল্টা-বিদ্রোহ অভিযানের মুখে কিভাবে এ উপ-অঞ্চলে নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়নের প্রয়াস চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে ? এ পরিপ্রেক্ষিতেই এটা বলা সমীচীন যে, ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোতে নয়াদিল্লীর বর্তমান পাল্টা-বিদ্রোহী অভিযানের সফল সমাপ্তি না হলে বাংলাদেশ সম্ভবত উপ-আঞ্চলিক উন্নয়নের নামে কেবলমাত্র তার শক্তিমান প্রতিবেশী দেশের অভ্যন্তরীণ ঝঞ্ঝাটে অনাহুত জড়িয়ে পড়বে। সমস্যা জর্জরিত বাংলাদেশের পক্ষে প্রতিবেশী দেশের এ ধরনের অন্ত:কলহে না জড়ানো শ্রেয় নয় কি? ইতিমধ্যে আসামের 'ঐক্যবদ্ধ আসাম মুক্তিফ্রন্টের' নেতা অনুপ চেটিয়ার বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ, তার গ্রেফতার ও বিচার এবং ভারত কর্তৃক তাকে ফেরৎ পাঠানোর দাবি, এ দায়িত্ব পূরণ করা হলে পক্ষান্তরে মুক্তিফ্রন্টের পক্ষ থেকে বাংলাদেশে নাশকতার হুমকি প্রভৃতি এ অঞ্চলে সম্পর্ক বিষিয়ে তোলার উপক্রম করে।

উপরন্তু, বাংলাদেশের জনমতের একটি বিরাট অংশ ভারতের প্রতিশ্রুতির বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে সন্দীহান। ব্যাখা হিসাবে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া সমীচীন। বেরুবাড়ির বদলে তিনবিঘার স্থায়ী ইজারার বিষয় উল্লেখ করা চলে। এ বিষয়ে ভারত প্রথম আওয়ামী লীগ সরকারের আমল থেকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বিগত খালেদা জিয়ার সরকারের আমলে বহু তিক্ততার পর স্বাক্ষরিত হয় ঘন্টাওয়ারী যোগাযোগের ব্যবস্থা। কিন্তু অঙ্গীকার অনুযায়ী স্থায়ী ইজারার বিষয় এখন আর কোন বিষয়ই নয়। অভিন্ন ভূ-সীমানা ও নৌ-সীমানা চিহ্নিত করার কোন লক্ষন দেখা যাচ্ছে না। ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনী বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশ সীমানা সোজাসুজি জেগে ওঠা নতুন কয়েকটি দ্বীপ দখল করে আছে। এ বিষয়ের সুরাহা করার মানসে ভারত আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতা মেনে নিতে চাচ্ছেনা, চাচ্ছে না পারস্পরিকভাবে গ্রহণযোগ্য কোনরূপ সমাধানও।

ইতিমধ্যে, ভারতের ভূসীমানাগত সংহতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক বাংলাদেশ তার অভ্যন্তরে ভারতের সংহতি বিরোধী কোন বিদ্রোহীকে আশ্রয় প্রদান না করার অঙ্গীকার করে; এমনকি জানা মতো এ ধরনের সকল বিদ্রোহীকে গ্রেফতারও করে। কিন্তু বিগত দু'দশকেরও অধিক কাল অবধি দু'দেশ সরকারী ভাবে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও ভারত পাবর্ত্য বিদ্রোহীদের আশ্রয়, প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রশাস্ত্রে সজ্জিত করে বাংলাদেশ বিদ্রোহী তৎপরতায় ইন্ধন যোগায়। যদিও সরকারী পর্যায়ে নয়াদিল্লী কখনো স্বীকার করেনি যে ভারত পার্বত্য বিদ্রোহে কোন ভাবে জড়িত রয়েছে। অস্বচ্ছতা ও সুসম্পর্ক একযোগে কার্যকর হয় না। ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক এর ব্যতিক্রম হতে পারে না। ১৯৯৭ সনের নভেম্বরে নয়াদিল্লী বাংলাদেশের একটি বন্ধুপ্রতিম সরকারকে পার্বত্য বিদ্রোহীদের সঙ্গে জাতীয় স্বার্থ বিরোধী একটি "শান্তি চুক্তি" স্বাক্ষরে প্ররোচিত করে বলে অভিযোগ রয়েছে, কিন্তু এটা অজানা নয় যে বিদ্রোহীদের একাংশ এখনো ভারতে অবস্থান করছে এবং একাংশ 'স্বায়ত্ব শাসনের' লক্ষ্যে দেশের অভ্যন্তরে ঢুকে ইতিমধ্যেই পুনর্বার নাশকতামূলক কাজে লিপ্ত হয়েছে।[২৩] অভ্যন্তরীণভাবে বিপন্ন বাংলাদেশ কিভাবে ভারতের সঙ্গে উন্নয়নের নামে উপ-আঞ্চলিক জোটভূক্ত হয়ে একযোগে কাজ করবে?

নিরাপত্তাহীনতায় বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণভাবে বিপন্ন নয় শুধু, বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কও প্রর্কত অর্থে বিপন্ন। নয়াদিল্লীতে পালাক্রমে সরকার পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও দু'দেশের সম্পর্কের মৌখিক অভিব্যক্তিতে বন্ধু সুলভ ভাব বজায় রাখার ভাষার অভাব নেই, কিন্তু একই সঙ্গে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে নয়াদিল্লীর অভিযোগের অন্ত নেই। অভিযোগ বিশেষ করে অব্যাহত রয়েছে ভারতে বাংলাদেশীদের অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে। তাই নয়াদিল্লীর পক্ষ থেকে মাঝে মধ্যে দু-দেশের ভারতীয়

সীমানা প্রান্তে কাঁটা তারের বেড়া ও 'ওয়াচ টাওয়ার' প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য শোরগোল শুনা যায়। কালো বাজারের ব্যবসা ছাড়াও দু'দেশের বাণিজ্যে ক্রমবর্ধমান অসমতা বাংলাদেশের অর্থনীতির ওপর প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি করে চলেছে, এমনকি স্বাবলম্বী অর্থনীতি গড়ার প্রয়াসে এতে বাংলাদেশ হুমকির সম্মুখীন। অথচ এতে ভারত গুরুত্ব দিয়ে কিছু করছে বলে মনে হয়না।

সবচেয়ে প্রকট হচ্ছে দু'দেশের পানি বন্টন সমস্যা। ভারত ও বাংলাদেশ ৫৪টি নদীর পানির শরীকদার, কিন্তু কার্যত নদীসমূহের উজান বা ওপরভাগে অবস্থিত ভারত তার অবস্থানের পুরো সুযোগ নিয়ে প্রায় একতরফা ভাবে প্রতিটি নদী থেকে শুষ্ক মওসুমে পানি প্রত্যাহার করে নিচ্ছে। নদনদীর স্বাভাবিক প্রবাহ থেকে বঞ্চিত নিম্নভাগে অবস্থিত কৃষি প্রধান বাংলাদেশ এতে অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত দিক থেকে বিপর্যস্ত। গঙ্গার পানির প্রবাহ ও ফারাক্কা বাঁধ হচ্ছে দু'দেশের পানি সমস্যার মূর্ত প্রতীক। ফারাক্কা বাধেঁর পরিকল্পনা হয়েছিলো ভারত-পাকিস্তান শত্রুতামূলক সম্পর্কের পটভূমিতে। অথচ এ বাধেঁর বাস্তবায়ন হয় বাংলাদেশ-ভারত বন্ধুপ্রতীম ও মৈত্রী সম্পর্ক কালে। ১৯৭৪ সনে ভারতীয় নেতৃত্বের ন্যায্যত পানির হিস্যা প্রদানের মৌখিক অঙ্গীকার এবং সম্ভবত রাজনৈতিক চাপের মুখে বাংলাদেশের তৎকালীন সরকার কোন ধরনের চুক্তি ছাড়াই ফারাক্কা সংযোগ খাল খোলাতে সম্মত হয়, কিন্তু অঙ্গীকার অনুযায়ী সেই পানির হিস্যা না পাওয়ার কারণে বাংলাদেশের এক-তৃতীয়াংশ এলাকায় দেখা দেয় মরুকরণ, পঙ্গু হয় কৃষিকাজ, লক্ষ লক্ষ লোক হয় বাস্তুহারা। ১৯৯৬ সনের ডিসেম্বরে ঢাকঢোল কূটনীতি সহকারে স্বাক্ষরিত হয় ৩০ বছর মেয়াদী গঙ্গা পানি চুক্তি, কিন্তু এ চুক্তি বাস্তবায়নের প্রথম বছরের শুষ্ক মৌসুমেই চুক্তি অনুযায়ী পানির হিস্যা না পাওয়ার কারণ হিসাবে সুবিধামত ব্যাখ্যা দেয়া হয় যে, "হিমালয়ের বরফ গলেনি" কিংবা শুষ্ক বালু পানি খেয়ে ফেলেছে।[৩০] এধরনের অঙ্গীকার না রাখা ও বিশ্বাস ভঙ্গের পটভূমিতে উন্নয়ন সম্পর্কের বন্ধন গড়া সম্ভব কি?

শুধু তাই নয়, বাংলাদেশে একটি বন্ধুপ্রতিম সরকার ক্ষমতা লাভের পরেও বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকায় ও সীমানা প্রান্তের বাংলাদেশের বেসামরিক জনগণের বিরুদ্ধে ভারতীয় সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনী (Border Security Forces বা BSF) সূচালো রনকৌশল প্রয়োগ করে চলছে প্রায় প্রতিনিয়ত, যদিও ঢাকা ও নয়াদিল্লীতে বন্ধু প্রতিম ভাব বিনিময়ে কখনো ভাটা পড়েনি। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, উন্নয়নের কূটনীতি এর কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে এগুতে হলে শান্তি ও দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের ব্যবস্থাপনার সমন্বয় বিধান করতে হবে। কিন্তু বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের সেই সমন্বয় এখনো পরিলক্ষিত হয়নি।

আঞ্চলিক প্রতিক্রিয়া

এবার আঞ্চলিক প্রতিক্রিয়ার প্রসঙ্গে আসা যাক, বিশেষ করে দেখতে হবে যেসব দেশ দক্ষিন এশীয় উপ-আঞ্চলিক সংস্থার সদস্য পদ লাভ করেনি তাদের দৃষ্টিভঙ্গী কিরূপ ? আঞ্চলিক শক্তি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রত পাকিস্তান এ সংস্থা সম্পর্কে তার গভীর আপত্তির ভাব ব্যক্ত করে। পাকিস্তান নীতিগতভাবে সার্কের কাঠামোর মধ্যে উপ-আঞ্চলিক জোট ব্যবস্থার বিরোধিতা করে, কেননা পাকিস্তানী দৃষ্টিকোণ থেকে এ জোটের মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়া ভিত্তিক সহযোগিতা দুর্বল করার একটি হীন উদ্দেশ্য কাজ করছে, উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশসহ ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় এলাকার রাজ্যসমূহ, নেপাল ও ভূটানকে নিয়ে একটি নতুন সামরিক কৌশলগত বাঁধন সৃষ্টি করা। এভাবে পাকিস্তানে দক্ষিণ এশীয় উপ-আঞ্চলিক জোট সম্পর্কে একটি দৃঢ় প্রত্যয়ের ভাব সৃষ্টি হয় যে, এটি হচ্ছে "সার্ককে ধ্বংস করার নয়াদিল্লীর একটি চালমাত্র যাতে এ অঞ্চলে ভারতের অবস্থান জোরদার হয়"।[৩১]

এবার শ্রীলংকার দৃষ্টিভঙ্গির দিকে দৃষ্টি দেয়া যাক। সাম্প্রতিককালে ভারত-শ্রীলংকা সম্পর্ক "চমৎকার" রূপ পরিগ্রহ করে। বস্তুত, দু'দেশের সম্পর্ককে কলম্বো বর্তমানে সর্বকালের মধ্যে সবচেয়ে উন্নত বলে মনে করছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও উপ-আঞ্চলিক জোট সম্পর্ককে কলম্বোর বক্তব্য অতি সুস্পষ্ট। কলম্বোর অনুভূতি হচ্ছে এরূপ: "সার্কভুক্ত যে কোন দু'টি দেশ যথার্থ-ই দ্বি-পাক্ষিক ব্যবস্থায় সম্মত হতে পারে। কিন্তু চারটি সার্কভূক্ত দেশ যখন উপ-আঞ্চলিক ব্যবস্থায় সংযুক্ত হয় এতে আঞ্চলিক সংগঠনের ভিত দুর্বল হবে।" শ্রীলংকার সরকারী কর্মকর্তাবৃন্দ সুস্পষ্ট ভাবে জানায় যে কলম্বো "উপ-আঞ্চলিক জোট গঠনের ফলে সার্ক দুর্বল হবে না, বরং সার্কের চেতনা আরো উজ্জীবিত হবে"— বাংলাদেশের পক্ষ থেকে উপস্থাপিত এ ধরনের বক্তব্য গ্রহণ করা কঠিন বলে মনে করে। তাই শ্রীলংকার প্রেসিডেন্ট কুমারাতুঙ্গে পাকিস্তান ও মালদ্বীপের নেতৃবর্গের প্রতি সমর্থন দিয়ে একই সুরে জানান যে উপ-আঞ্চলিক জোট প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে আঞ্চলিক সংগঠন প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হবে। বিষয়টি শ্রীলংকার একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ব্যাখ্যা করেন এভাবে, "আমাদের বিশ্বাস যে উপ-আঞ্চলিক জোট সার্কের কর্মকান্ডে বাধা হয়ে দাঁড়াবে, কেননা এই উপ-আঞ্চলিক সংস্থার সদস্যবর্গ সেই জোটের প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়নে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করবে, ফলে গুরুত্ব হারাবে সার্কের কর্মকান্ড।"[৩২]

সংগতভাবে দক্ষিন এশিয়ার অংশবিশেষ না হলেও এ বিষয়ে চীনের মতামতও প্রণিধানযোগ্য। কেননা চীন এই ধরনের অভিমত পোষণ করে যে, দক্ষিন এশীয় উপ-আঞ্চলিক জোটভূক্ত দেশগুলো ব্রক্ষ্মপুত্র অববাহিকায় কোন

সহযোগিতামূলক প্রকল্প হাতে নিলে চীনকে অর্ন্তভুক্ত না করে এর বাস্তবায়ন কঠিন হবে। বাংলাদেশের অবকাঠামোগত উন্নয়নে চীন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ১৯৮০-এর দশক থেকে। দু'দেশের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্কও বেশ ঘনিষ্ঠ। ভূকৌশলগত কারণে নেপালেও চীনের আগ্রহের ঘাটতি নেই। বস্তুত, হিমালয়ের ঐ প্রান্তে অবস্থিত সুবিশাল দেশ ও একটি উঠতি পরাশক্তি হিসাবে হিমালয়ের এ প্রান্তে কি ঘটছে সেই ব্যপারে চীন আগ্রহী না হয়ে পারে না। অবশ্য চীন মনে করে যে, উপ-আঞ্চলিক জোট এখনো ধারণাগত পর্যায়ে রয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর পূর্ণাঙ্গ রূপ দেয়ার পূর্বে বার বার ভাবা উচিত যে কতখানি তারা এ সংস্থার মাধ্যমে লাভবান হতে পারে । কিন্তু চীনের বক্তব্য থেকে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না যে এ বিষয়ে চীনের আগ্রহ বেশ গভীর। ঢাকাস্থ চীনের রাষ্ট্রদূতও তাঁর দেশের বক্তব্য তুলে ধরেন এভাবে "সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী আমরা ঘনিষ্ঠ ভাবে প্রত্যক্ষ করছি। ঘটনাপ্রবাহ সত্যিকার অর্থে কোনদিকে মোড় নিচ্ছে আমরা বুঝতে পারছি না"।[৩৩]

পরিবর্তনশীল উপ-আঞ্চলিক কূটনীতি

উপ-আঞ্চলিক কূটনীতির শুরু থেকে বর্তমানকাল অবধি এ সম্পর্কিত বাংলাদেশের সরকারী ভাষ্য বোঝা দায়। এর কারণ সরকারী অবস্থানের পরিবর্তনশীল রূপ, প্রায়শ বিপরীতধর্মী কূটনৈতিক ইঙ্গিত। ফলে মুসকিল বোঝা যে উপ-আঞ্চলিক ধারণা কি সার্কের ভেতর না বাইরে বাস্তবায়িত হতে চলছে। উপ-আঞ্চলিক জোটের প্রকৃত কাঠামোগত যোগসূত্র বা সংযোগ সম্পর্কে বাংলাদেশ সরকার পরস্পর-বিরোধী বক্তব্য রেখে আসছে। বেশ কিছুকাল ঢাকায় সরকারী বক্তব্য ছিল একই রূপ: সার্ক সনদের সপ্তম ধারায় সার্কের আওতায় উপ-আঞ্চলিক জোট গঠন করা যেতে পারে। কিন্তু পাকিস্তানসহ উপ-আঞ্চলিক জোট বহির্ভূত অন্যান্য রাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়া জানার পর উপ-আঞ্চলিক জোট যে সার্কের আওতাধীন বলা হচ্ছিল সেই ধরনের বক্তব্য থেকে বাংলাদেশ স্পষ্টতই তার অবস্থান পরিবর্তন করে। মালে সার্ক শীর্ষ সম্মেলনের পূর্বাবধি বক্তব্য রাখা হচ্ছিল যে দক্ষিণ এশীয় উন্নয়ণ চতুর্ভূজ গঠিত হচ্ছে সার্কের বাইরে, কিন্তু মালে শীর্ষ সম্মেলনের পর থেকে আবার বলা হচ্ছে যে সার্ক সনদের আওতায়-ই গঠিত হচ্ছে দক্ষিন এশীয় উন্নয়ন চতুর্ভূজ।

এ ধরনের পরিবর্তনশীল, পরস্পর-বিরোধী বক্তব্যে এমনকি নেপালের মতো দেশও খানিকটা বিভ্রান্ত হয়, যদিও বাংলাদেশের সঙ্গে নেপালও দৃশ্যত হচ্ছে উন্নয়ন চতুর্ভূজ-এর সহ-উদ্যোক্তা। বাংলাদেশের মতো নেপালেও উপ-আঞ্চলিক জোটের গঠনের প্রক্রিয়াগত স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্নের অবতারণা করা হয়। কাঠমুন্ডুতে সার্কে আগ্রহী জনৈক পর্যবেক্ষক বলেন, "আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলোর

স্পর্শকাতরতায় আঘাত না হেনে যদি উপ-আঞ্চলিকতার ভিত গড়ে তুলতে হয় তাহলে পূর্ণ স্বচ্ছতার নিশ্চয়তা বিধান করা প্রয়োজন। তা না হলে সার্কের মাধ্যমে অঞ্চলব্যাপী অতি সযত্নে সহযোগিতার যে চেতনা সঞ্চার হয়েছে সেটাই ধুলিসাৎ হবে।"[৩৪]

দৃশ্যত দক্ষিণ এশীয় উন্নয়ন চতুর্ভূজ সম্পর্কে ভারত তেমন উচ্চবাচ্য করছে না, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষন প্রধানত দিয়ে আসছে এই উপ-আঞ্চলিক জোটের দুই ক্ষুদ্রতর মিত্র দেশের নেতৃবর্গ। সরকারী পর্যায়ে বাজপায়ী সরকার ক্ষমতায় আসা অবধি নয়াদিল্লীর অভিমত ছিল চার জাতি সমন্বয় গঠিত উপ-আঞ্চলিক জোট কেবলমাত্র কতকগুলো নির্দিষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য। এ ধরনের বক্তব্য অবশ্য সার্ক সনদের পরিপন্থি নয়। ভারত ইতিমধ্যে এরূপ মন্তব্যও করে যে, দুই বা ততোধিক সার্ক সদস্য কোন ধরনের উপ-আঞ্চলিক জোটে সংযুক্ত হলে বা গঠন করলে তাদের উচিত হবে অন্যান্য সদস্যদের এ সম্পর্কে অবহিত রাখা। এ জাতীয় মতামত শ্রীলংকার এ সম্পর্কিত অবস্থানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

মতামতগুলো বেরিয়ে আসে সার্কের পররাষ্ট্র সচিব সম্মেলনের পর্যায়ে। পাকিস্তান, মালদ্বীপ এবং শ্রীলংকা উপ-আঞ্চলিক জোট সম্পর্কে আপত্তি জানানোর পর ভারত এ সম্পর্কে তার নিজস্ব অবস্থানের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে শ্রীলংকার প্রস্তাব অনুযায়ী একটি সমঝোতা ফর্মূলা গৃহীত হয়। মালে সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে সেই সমঝোতাই অনুমোদিত হয়। বর্তমানে দক্ষিন এশীয় উন্নয়ন চতুর্ভূজ সার্ক সনদের অনুমোদন যোগ্য সীমারেখার মধ্যে থাকবে বলে মনে করা হচ্ছে। যেটা এখনো বোঝা যাচ্ছে না তাহলো এ ফর্মূলা কি ঐ সময়ে পাকিস্তানের স্পর্শকাতরতাকে তুষ্ট রাখার জন্যই গৃহীত হয়েছিলো ? এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা চলে যে, তদানিন্তন যুক্তফ্রন্ট কোয়ালিশন সরকারের আমলে ভারত পাকিস্তানের সঙ্গে উন্নততর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে শান্তি সংলাপ চালিয়ে আসছিলো এবং সম্ভবত উপ-আঞ্চলিক জোট সম্পর্কিত সার্ক ভিত্তিক সমঝোতা সেই প্রক্রিয়ার-ই অংশ বিশেষ ছিল।[৩৫] অবশ্য উপ-আঞ্চলিক জোটের মূল সমস্যা এখানে নয়, সমস্যা হচ্ছে উন্নয়ন চতুর্ভূজের অভ্যন্তরেই: এখনো এটা স্পষ্ট নয় যে কোন কোন সুনির্দিষ্ট প্রকল্পে জোটভূক্ত চারটি দেশ অভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনে সম্প্রীতি সহকারে একযোগে কাজ করতে পারে যাতে তাদের নিজ নিজ মনস্তাত্ত্বিক প্রত্যক্ষ অনুভূতি তিক্ততার দিকে না যায়, যাতে একে অপরের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিরূপ প্রশ্নের অবতারণা করতে না পারে।

প্রকৃত প্রস্তাবে যা' বোঝানো হচ্ছে তা' হলো, দক্ষিন এশীয় উন্নয়ন চতুর্ভূজের উত্থাপন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় প্রতিটি পদক্ষেপ মনে হবে সাময়িক ভিত্তিক,

কোনরূপ দূরদর্শী পরিকল্পনা বা দিকদর্শনের অভিব্যক্তি এতে রয়েছে বলে মনে হয় না। তদুপরি, বিভিন্ন দেশের জনমতকে এর সঙ্গে সম্পৃক্ত করার কোন ধরনের প্রয়াস লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। বিশেষ করে বাংলাদেশে জনমতের পর্যায়ে জাতীয় স্বার্থ চিহ্নিতকরণ ও অর্জনে দ্বিধাবিভক্ত জনমতকে সম্প্রীতিমূলকভাবে সুসংহত করতে হবে, জনগণকে অবশ্য আশ্বস্ত করতে হবে যে বাংলাদেশসহ প্রতিবেশীদেশগুলোর ঐশ্বর্য্য ভারতের ভাগ্য-ভবিষ্যৎ থেকে অবিছিন্ন। অনুরূপ ভাবে, প্রকৃতি ও পরিবেশের বন্ধন এসব দেশে এতখানি প্রবল যে জনগণের অনুভূতিকে জয় করার উদ্দেশ্যে এরূপ যুক্তিরও অবতারণা করা যেতে পারে যে, "দক্ষিন এশিয়ার ক্ষুদ্রতর দেশগুলির কোনটাই প্রকৃত অর্থে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে উন্নতি লাভ করতে পারে না, যদিও তাদের প্রত্যেকটি কোন না কোন ভাবে ভারতের ভরাডুবিতে অবদান রাখতে পারে।"[৩৬] মোট কথা, রাজনৈতিক-সীমানাগত বিভাজনের উভয় পাশে জনমতকে উন্নয়ন চতুর্ভূজের সুফল সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে আশ্বস্ত করতে হবে, এভাবে জনমতকে সমাবেশ করতে হবে যাতে প্রত্যয় হয় যে এ ধরনের উন্নয়ণ প্রক্রিয়া থেকে চূড়ান্ত বিশ্লেষণে সকলেই লাভবান হবে।

যত সহজে বলা হয়েছে কাজটি তত সহজে তা অর্জন সম্ভব নয়। বরং রাজনীতিক ও নীতি-নির্ধারকদের জন্য এ হচ্ছে এক কঠিন পরীক্ষামূলক কাজ, উভয় সংকটমূলক অবস্থা। বস্তুত এক্ষেত্রেই দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতির মোকাবেলায় তাঁদের কলা-কৌশলের নৈপুণ্যের পরিচয় মেলবে, বোঝা যাবে যে একটি ধারণা জন্ম দিয়ে বা সংস্থার রূপরেখা প্রনয়ণ করে তাঁরা জনমতকে কি করে এর সঙ্গে আবদ্ধ করতে পারেন যাতে জনমতে এর সম্ভাবনা সম্পর্কে স্বত:স্ফূর্ত অনুরাগ জন্মে এবং একই সঙ্গে স্বল্পমেয়াদী দৃষ্টিকোণ থেকে অভ্যন্তরীন ক্ষেত্রে বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি না হয়। এসব বিষয়ে মনে রাখা প্রয়োজন যে, জনগণের দাবি হচ্ছে সামাজিক ন্যায় বিচার ও উন্নয়ন। তাদের এ ধরনের আশা-আকাঙ্ক্ষার সম্পূরনে নি:সন্দেহে "প্রয়োজন হচ্ছে বৃহত্তর পরিমন্ডলে সহযোগিতা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুফল অর্জন লাভ কল্পে সময়ের ব্যপ্তিতে অধিককাল ধৈর্য্যধারণ। স্পেস ও সময়ের দ্বি-বিভাজনে জাতি-রাষ্ট্র তার সার্বভৌমত্ব এবং এর সীমাবদ্ধতা নিয়ে দ্বন্দ্বের মুখোমুখি হয়, একদিকে যাকে জনপ্রিয়তার চাপ এবং অন্যদিকে রয়েছে দীর্ঘ মেয়াদী সমাধানের আবশ্যকতা।"[৩৭] এক্ষেত্রেও সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের নেতৃত্বের প্রসঙ্গই এসে পড়ে: স্বল্প-কালীন স্পর্শকাতরতা ও দীর্ঘমেয়াদী হিসেবপত্রের মধ্যে সমন্বয় বিধান করার বিষয়ে নেতৃত্বের ভূমিকা মুখ্য হলে প্রতীয়মান হয়।

উপসংহার

বর্তমান যুগ হচ্ছে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সহযোগিতামূলক নিরাপত্তা অন্বেষনের যুগ। নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়নের লক্ষ্যই হবে তাই বাংলাদেশের জন্য নিশ্চিতভাবে কাঙ্খিত লক্ষ্য। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কি ভাবে এ ধরনের লক্ষ্য অর্জন সম্ভব ? আঞ্চলিক শান্তি কিংবা উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা অর্জনের লক্ষ্য বিস্মৃত হতে হবে যদি যথার্থ দক্ষতা ও নৈপূন্য সহকারে এ লক্ষ্যে প্রয়াসী না হওয়া যায়। উপ-আঞ্চলিক উন্নয়নের লক্ষ্য প্রয়াসী হতে হলে বাংলাদেশ সহ প্রতিটি দেশকে এধরনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে সমঝোতা অর্জন করতে হবে। কেননা অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক শূন্যতার ওপর আঞ্চলিক সংহতি কিংবা উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার ভিত গড়ে উঠতে পারে না—[৩৮] জাতীয় পর্যায়ে সমঝোতার অভাব থাকা রাজনৈতিক শূন্যতার-ই শামিল।

বস্তুত, জাতীয় সমঝোতা ছাড়া উন্নয়ন সম্ভব নয়, এবং জাতীয় সমঝোতা ছাড়া "উন্নয়ন" সংস্থায় তৎপর হওয়ার অর্থ হবে আরো বিভাজন সৃষ্টি; ফলে যে উদ্দেশ্য সাধনে এ ধরনের সংস্থা সৃষ্টি করা হচ্ছে সে উদ্দেশ্য অধিকতর বানচাল হতে বাধ্য। তাই উন্নয়নের লক্ষ্যে কোনরূপ সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ বা উপ-আঞ্চলিক পর্যায়ে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা জোরদার কল্পে কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হলে সরকারের পক্ষ থেকে একরোখা দৃষ্টিভঙ্গির ধারা পাল্টাতে হবে, জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্বশীল রাজনৈতিক দল সমূহকে নিয়ে জাতীয় পর্যায় আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে উপ-আঞ্চলিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে জনমনে আস্থা স্থাপন করতে হবে।

একইভাবে আঞ্চলিক পর্যায়েও সমঝোতা অপরিহার্য। কেননা দক্ষিন এশিয়ার দেশগুলোতে প্রচলিত রাজনৈতিক প্রভাবের ধারায় উপচে পড়া প্রবণতা বর্তমান। ফলে উপ-আঞ্চলিক উন্নয়ন চতুর্ভূজ যতই মহৎ উদ্দেশ্যের দিশারী বলে উপস্থাপিত হোক না কেন আঞ্চলিক রাজনীতির কলুষতা থেকে স্পর্শ করতে পারে। অবশ্য বর্তমানকালে বিশ্বব্যাপী "সহযোগিতামূলক নিরাপত্তা" গড়ে তোলার ক্ষেত্রে একটি গতিধারা পরিলক্ষিত হচ্ছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে সার্কের ভেতর ও বাইরে সকল ধরনের সম্পর্কের যোগসূত্র ও সহযোগিতার পরিধি অধিকতর বিস্তৃত ও গভীরতর করা বাঞ্চনীয় বলে প্রতীয়মান হয়। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির জন্য যে অন্বেষা তা বস্তুত সার্বিক নিরাপত্তার সঙ্গে সম্পৃক্ত। আসিয়ানভুক্ত পাশ্ববর্তী দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর অনুন্নয়নজনিত সমস্যাবলী মোকাবেলায় তাদের অভিজ্ঞতা এবং তাদের ধারণাকৃত "পারস্পরিক নির্ভরশীল উন্নয়ন" ঐ অঞ্চলে এরূপ ধারণার প্রয়োগ প্রভৃতি সার্কভুক্ত দেশগুলোর জন্য পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ভিত্তিক

গতিশীল সম্পর্কে প্রতিষ্ঠায় অনুকরণীয় মডেল হিসেবে প্রেরণা যোগাতে পারে। তবে দু'অঞ্চলের ভিন্নতর অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতও মনে রাখতে হবে।

এরপর প্রসঙ্গ হচ্ছে সহযোগিতার কাঠামো। সার্ক সনদে উল্লেখিত (৭নং ধারা) বিশেষ বাস্তবায়ন কমিটি (action committee) এবং প্রকল্পভিত্তিক কার্যক্রমই (project-wise approach) মনে হয় সঠিক পন্থা। তত্ত্বীয় পর্যায়ে এটা ব্যবহারিক/নব্য-ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণের সমন্বয় ঘটাবে এবং সার্ক সনদে সেই দিক-নির্দেশনা-ই রয়েছে। একই রূপে এ প্রক্রিয়া সম্ভাব্য ভিন্নমতাবলম্বী বা বিনষ্টকারীদের গঠনমূলকভাবে সক্রিয় হতে সহায়ক হবে। একই লক্ষ্যে, দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা চলে যে, দক্ষিন এশীয় উন্নয়ন চতুর্ভূজের কোন কোন উন্নয়ন প্রকল্পে পাকিস্তানের বেসরকারী খাতকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অংশগ্রহনের সুযোগ প্রদান করা যেতে পারে, দেখতে হবে কিভাবে ভারত ও পাকিস্তানের সাম্প্রতিক কালীন প্রশমিত উত্তেজনা এবং সংলাপের প্রক্রিয়াকে ফলপ্রসু ভাবে কাজে লাগানো যায় যাতে ইসলামাবাদে এ ধরনের কোনরূপ অনুভূতি সঞ্চার করা হয় যে ইচ্ছামূলক ভাবে পাকিস্তানকে বাদ দেওয়া হচ্ছে বা দূরে রাখা হচ্ছে। আঞ্চলিক সমঝোতার পূর্ব হিমালয় উপ-অঞ্চলে যে কোন সকল উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে একই লক্ষ্যে তা একই ধরনের সহযোগিতার চেতনায় জম্মু ও কাশ্মীর উপত্যকায়ও অনুকরণ করা যেতে পারে। অবশ্য তা যোদ্ধাভাবে নির্ভর করবে ভারত-পাকিস্তান সংলাপ কোন পর্যায়ে উত্তরণ ঘটেছে। ধারণাগত দৃষ্টিকোণ থেকে, দক্ষিন এশীয় জনগণের ভবিষ্যৎ ভাগ্য, শান্তি ও উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা মূলক নিরাপত্তার দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে সঠিক পন্থা এ রূপরেখায় নিহিত।

এরপর উপ-আঞ্চলিক পর্যায়ে কি ধরনের সুনির্দিষ্ট প্রকল্পে উন্নয়নমূলক সহযোগিতা হতে পারে সে প্রসঙ্গে আসা যাক। পূর্ব-হিমালয়, উপ-আঞ্চলিক চারটি সরকার সহযোগিতা শুরু করতে পারে পানি সম্পদ উন্নয়ন ও বন্টন থেকে। প্রকৃত প্রস্তাবে এর ভিত্তিও তৈরী হয়েছে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর পারস্পরিক পানি চুক্তি থেকে। এসব চুক্তি অবশ্যই অভিযোগ বা ত্রুটিমুক্ত নয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও পর্যায়ক্রমে সমঝোতা ও সহযোগিতার পরিধি যতই বৃদ্ধি পাবে ততই অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণে উৎসাহ সঞ্চার হবে। আন্তর্জাতিক দাতাদেশ ও সাহায্য সংস্থাগুলো সেক্ষেত্রে উপ-আঞ্চলিক উন্নয়নে সমর্থন প্রদানে প্রকৃত অর্থে উৎসাহিত হবে।

কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, পানি সম্পদ উন্নয়ন যদিও গুরুত্বপূর্ন বলে বিবেচিত এবং বেসরকারী সংস্থাগুলোও এ বিষয়েই সহযোগিতার ওপর জোর দিয়ে আসছে, তবু নতুন উপ-আঞ্চলিক সংস্থার ধারণায় এ বিষয় অগ্রাধিকার লাভ করেনি। সম্মত "ধারণা পত্রে" রয়েছে মহিলা ও শিশু পাচার। সীমান্ত বাণিজ্য ও

চোরাকারবারী, পরিবেশগত দূষণ ও নদী শাসন, উপ-অঞ্চল পর্যায়ে বিদ্রোহ ও সন্ত্রাস দমনের মতো অভিন্ন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি।[৯] বলা প্রয়োজন যে, এসবের মধ্যে কিছু কিছু হচ্ছে বিতর্কিত বিষয়, বিশেষ করে শেষোক্ত বিষয়টি রাজনৈতিক ভাবধারা দুষ্ট এবং স্বাভাবিক কারণে রাজনৈতিক বিতর্কের ঝড় সৃষ্টি করতে পারে যা উন্নয়ন প্রক্রিয়ার পক্ষে অনুকূল নয়।

উপ-অঞ্চলিক কিংবা অঞ্চল যে-কোন পর্যায়ে দক্ষিন এশিয়ায় সহযোগিতার অনুকূল পরিবেশ নির্ভর করছে আন্তরিকতাপূর্ণ কূটনৈতিক পরিচর্যার ওপর। এর জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রপ্রজ্ঞা সুলভ নেতৃত্বের। এর সঙ্গে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে আরো প্রয়োজন অব্যাহত সদিচ্ছা ও নিরবছিন্ন আস্থার পরিবেশ; একই ধরনের উপাদানের সমন্বয় ঘটাতে হবে যুগপৎভাবে আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক পর্যায়ে। অথচ সিদ্বান্তগ্রহণের ক্ষেত্রে প্রায়শ এসব উপাদান বিবেচনায় রাখা হয় না। পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, রাজনীতির অপরিণামদর্শী ধারা এবং নেতৃত্বের অদূরদর্শী সিদ্ধান্ত প্রকৃত সহযোগিতার আশা নিরর্থক করে চলছে।

বাংলাদেশের সহযোগিতা দৃষ্টিকোণের প্রসঙ্গে আবার আসা যাক। বাংলাদেশ আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক পর্যায়ে সহযোগিতা ক্ষেত্রে তার "যুগপৎ উদ্যোগ" নিয়ে গর্ব করে আসছে, কিন্তু এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া, লাভ-লোকসান প্রভৃতি সম্পর্কিত রাজনৈতিক বিচারবুদ্ধি ও কার্যকারিতা সম্পর্কে গুরুতর প্রশ্নের অবতারণা করা যেতে পারে। বাংলাদেশ সরকার অতি দ্রুত পর পর তিনটি সহযোগিতা সংস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়-এগুলো হচ্ছে উন্নয়ন চতুর্ভূজ, বিস্টেক/বিমেস্টেক, এবং পরিশেষে ডি- ৮ কোন কোন ক্ষেত্রে যুগপৎ দু'বার এমনকি আঞ্চলিক সংগঠনসহ বাংলাদেশ তিন বারও একই রাষ্ট্রের সঙ্গে সদস্যপদ লাভ করেছে। তদুপরি আবার ভারত ও পাকিস্তানকে নিয়ে ত্রিপক্ষীয় ব্যবসায়িক শীর্ষ পর্যায়ের বৈঠকও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার প্রয়াস চলছে। অথচ এ ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপনের প্রক্রিয়া থেকে সার্কভুক্ত অন্যান্য দেশকে বাদ দেয়া হয়েছে যদিও মালে অনুষ্ঠিত শীর্ষ সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০০১ সালের মধ্যে সমগ্র দক্ষিণ এশিয়াতেই 'মুক্ত বানিজ্য এলাকা'(সাফটা) গড়ে তোলার কথা সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের উপ-আঞ্চলিক ও আঞ্চলিক কূটনীতিতে দূরদর্শিতা ও দিকদর্শনের অভাব রয়েছে বলে মনে হয়। দেশের উন্নয়ন কূটনীতিতে এমনকি বিভ্রান্তিও পরিলক্ষিত হচ্ছে।

বস্তুত, বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারকবৃন্দ বর্তমানে একই সঙ্গে চ্যালেঞ্জ এর সম্মুখীন এবং সুযোগ প্রত্যাশী পররাষ্ট্রনীতির চাল ও কূটনৈতিক নৈপূণ্য দিয়ে তাঁদের এখন দেখাতে হবে যে কিভাবে তারা সেই চ্যালেঞ্জ এর মোকাবেলা করছেন, সম্ভাব্য কি সুযোগের সদ্ব্যবহার করে কি ভাবে জাতীয় প্রত্যাশা পূরণ

করছেন। এটা দেখবার মতো যথার্থ-ই একটি দৃশ্যমান বিষয় যে বাংলাদেশ ভারত মহাসাগরীয় সহযোগিতা সংস্থার সম্ভাব্য সদস্যপদসহ এতগুলি আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সংগঠনে সক্রিয় ভূমিকা ও স্পন্দমান কর্মকান্ড কিভাবে অব্যাহত রেখে চলবে। অবশ্য সরকার অব্যাহতভাবে তার বহুমাত্রিক উন্নয়ন কূটনীতি সগৌরবে প্রচার করে চলছে, এতে উত্তরোত্তর আশার সঞ্চার হচ্ছে অনাগত ভবিষ্যতের সম্ভাবনা সম্পর্কে। এসব প্রশ্নের উদ্রেক হয় শুধু দেশের নীতি নির্ধারক রাজনীতিক ও কূটনৈতিকবৃন্দ সর্বাগ্রে দেশের স্বার্থ সুনিশ্চিত করলে কতখানি বদ্ধ পরিকর ? [৪০]

এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর যাই হোক, বাংলাদেশকে শিখতে হবে অন্যান্য দেশের উন্নয়নমূলক সহযোগিতা আঞ্চলিকতা ও উপ-আঞ্চলিকতার অভিজ্ঞতা থেকে। সেই অভিজ্ঞতা এরূপ দিক-নির্দেশনা দেবে যে বাংলাদেশের সঙ্গে অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর উন্নয়নের পল্লবিত কূটনীতি একমাত্র তখনি সঞ্চালিত ও সুতীব্র হতে পারে যখন বহুবিধ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয় ঘটবে, গড়ে তোলা হবে সম্প্রীতি ও সমঝোতা। জাতি যখন দ্বিধান্বিত, নিয়তির যথার্থ ধারণা থেকে জাতি মনে হয় প্রবঞ্চিত এবং সান্নিধ্যে আসে এরূপ একটি রাষ্ট্রের যার উদ্দেশ্যাবলী সন্দেহের উদ্রেক ঘটায়, পরিণতি তখন হতে পারে ভয়াবহ নেতৃত্ব যদি উন্নয়নের নামে এমন কূটনীতিতে প্রবৃত্ত হয় যা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

বাংলাদেশকে তার আঞ্চলিকতার নিজস্ব অভিজ্ঞতার কথাও ভুললে চলবে না। সার্ক মুখ্যত গঠিত হয়েছিলো বাংলাদেশের উদ্যোগেই। সেই সার্কভিত্তিক আঞ্চলিকতার ক্ষেত্রে গতিময়তায় প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় বৃহত্তম আঞ্চলিক শক্তির একদেশদর্শী মনোভাব; উপ-আঞ্চলিকতার ক্ষেত্রেও সেই অপ্রতিসম আশা-আকাঙ্ক্ষা-ই প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতে পারে। বাংলাদেশের মতো জনবহুল অথচ ক্ষুদ্রদেশের উন্নয়ন কূটনীতি অবশ্যই হতে হবে জনগণের প্রতিসম আশা-আকাঙ্ক্ষা ভিত্তিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে তা হবে ' 'প্রতিসাম্য-উন্নয়ন', 'আন্ত:নির্ভরশীলতা' 'পারস্পরিকভাবে আন্ত:নির্ভরশীল উন্নয়ন' প্রমুখ নীতিভিত্তিক। ব্যবসায়িক লেনদেন, যোগাযোগ-ট্রানজিট, পরিবেশের ভারসাম্য বিধান, পানির প্রবাহ বৃদ্ধি ও পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রকল্প গ্রহণ বা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের উন্নয়ন কূটনীতি উপর্যুক্ত নীতিমালা দ্বারা পরিচালিত হবে এটাই কাম্য ও স্বাভাবিক।

তথ্যনির্দেশ

১. এ বিষয়ে লেখকের ইংরেজীতে লেখা প্রবন্ধের মধ্যে রয়েছে, "SADT and the Politics of Subregionalism, *The Daily Star* (12 May 1997), p.5; "Growth Diplomacy or Showmanship?" *The Envoy*, No. 2 (1997); "Growth Structure: Politics of Subregionalism in Bangldesh," (Paper presented at the ISAB Seminar, Dhaka, July 1997); "SAARC Subregionalim and Bangladesh Foreign Policy", *Spotlight on Regional Affairs* (Islamabad), (September 1997); *Regional Studies* (Autumn, 1997).

২. দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিকতা ও উপ-আঞ্চলিক সিস্টেম সম্পর্কিত লেখকের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য, "আঞ্চলিকতা সিস্টেম তত্ত্ব ও দক্ষিণ এশিয়া", (দশম অধ্যায়), আবুল কালাম, *আন্তর্জাতিক সম্পর্ক: তত্ত্বীয় ও বাস্তব রূপ* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯০)।

৩. James H. Lane, "Contributions of the Emerging Field of Conflict Resolution," in W. Scott Thompson and Kenneth M. Jensen (eds.), *Approaches to Peace*: An *Intellectual Map* (Washington, D.C.: United Institute of Peace, 1991), পৃ: ৩০১।

৪. Ernst B. Haas, *The Uniting of Europe: Political Social and Economic Forces 1950 -1957* (Stanford: Stanford University Press, 1958); Ernst B. Haas and Philippe C. Schmitter, "Economic and Differential Patterns of Political Integration: Projection About Unity in Latin America, "*International Organization*, vol. xxiii. No. 3 (Winter 1969); Roger D. Hansen, "Regional Integration: Reflections on a Decade of Theoretical Efforts", *World Politics*, vol. Xxi, No. 2 (January 1967), পৃ: ২৪২-২৪৭; Philippe Schimtter, "Three Neo-Functional Hypotheses About International Integration", *International Organization*, vol. 13, No. 4 (1969).

৫. The White House, *A National Security Strategy of Engagement and Enlargement* (Washington, D.C.: U.S Government Printing Office, February 1996); also Estrella Solidum, *Bilateral Security in ASEAN* (Manila: Foreign Service Institute, 1983).পৃ: ১।

৬. এ বিষয়ে বাংলাদেশের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যার জন্য দ্রষ্টব্য, Bangladesh Institute of International and Strategic Studies, *ASEAN Experiences of Regional and Inter-regional Co-operation: Relevance for SAARC* (Dhaka: BIISS, September 1998); Ashraful Hasan and Zius Shams,

"Interdependent Development: Bangladesh, SAARC and ASEAN," *South Asian Perspective*, No. 2 (May 1993), পৃ: ২৩ - ২৪ ।

৭. Hasan and Shams, প্রাগুক্ত, পৃ: ২১; *Bangladesh Institute of International and Strategic Studies*, প্রাগুক্ত ।

৮. Sridhar K.Khatri, *SAARC and ASEAN: A Comparative Study*, (A Paper presented at a seminar on 'SAARC: Retrospect and Prospect', sponsored by the Centre for Nepal and Asian Studies, Tribhuvan University, Kathmandhu, October, 19 20, 1987), পৃ: ৫২ - ৫৩ ।

৯. *ASEAN Update* (1995), পৃ: ৪-৬, ১৫-১৬ ।

১০. V. Jayanath, "For Security and Growth: The Fifth ASEAN Summit, *Frontline* (26 January 1996); also his "A Dialogue Partner", *Frontline* (26 January 1996), পৃ: ৪৩ ।

১১. *ASEAN Update* (1995), পৃ: ৫ ।

১২. উদ্ধৃত অংশসমূহ যথাক্রমে R.A. Scalapino, Tang, Thant and Marty এবং *The Economist* (London) থেকে নেয়া । দ্রষ্টব্য Mohammad Humayun Kabir, Research Paper on "Growth Tringles in ASEAN: Relevance for Sub-regional Co-operation in South Asia," Institute of South East Asian Studies, Singapore, (October-December 1997) (Draft, Mimeo), পৃ:, ৮ ।

১৩. ঐ, পৃ: ১০ ।

১৪. N. Genesan, "Rethinking ASEAN as a Security Community in South East Asia, " *Asian Affairs: An American Review*, vol.21, No. 4 (Winter 1996), পৃ: ২২০-২২১ । আসিয়ানের উন্নয়ন ত্রিভূজ সম্পর্কিত আরো কিছুকাল পূর্বের দৃষ্টিকোণ ব্যাখ্যার জন্য দ্রষ্টব্য, Pushpa Thambipillai, "The ASEAN Growth Triangle: The Convergence of National and Sub-National Interests", *Contemporary Southeast Asia* (December 1991).

১৫. দ্রষ্টব্য, B.G Verghese, *Waters of Hope: Interrgated Water Resource Development and Regional Co-operation within the Himalayan Ganga-Brahmaputra-Barak Basin* (New Delhi: Oxford and IBH Publication Co. 1993); Q.K Ahmad, B. G. Verghese, Ramaswamy

R. Iyer, B.B Pradhan, S.K. Malla (eds.), *Converting Water into Wealth* (Dhaka: Academic Publishers, 1994); Q.K. Ahmed, Nilufar Ahmed and K.B. Sajjadur Rasheed (eds), *Resources, Environment and Development in Bangladesh: With Particular Reference to the Ganges, Brahmaputra and Meghna Basin* (Dhaka: Academic Publishers, 1994).

১৬. Amanullah, "Controversies dog regional grouping idea", *Holiday* (Dhaka), (9 May 1997), পৃ: ৮।

১৭. উদ্ধৃত, "Environmentalism in South Asia: Building a Shared Water Community in the Eastern Himalayan region, " *BIISS Journal,* vol. 17, No. 4 (1996), পৃ: ৫৩৫।

১৮. Professor Muhammd Maniruzzaman Mia, "One Year of India-Bangladesh Relations," *Bhorer Kagaz* (Bengali), (23 June1997).

১৯. M. Anwarul Haq, "Dhaka preparing concept paper on Sub-regional grouping", *The Daily Star* (Dhaka, 6 February 1997), পৃ:. ১২।

২০. "Hasina-Gowda joint press Conference: Teesta next focus, JEC takes up transit issue in March", *The Daily Star* (8 January 1997), পৃ:. ১, ১২।

২১. "PM at graduation ceremony of DSCSC: Goverment wants sub-regional economic co-operation", *The Daily Star* (30 January 1997), পৃ: ১; "Prime Minister Warns Bye-elections if BNP MPs fail to return to JS 90 days," *The Daily Star* (11 January 1997); "Sub-regional grouping to boost trade among 4 SAARC States: PM", *The Daily Star* (9 January 1997), পৃ:. ১, ১২।

২২. "Sub-regional grouping a move to destroy SAARC: Khaleda", *The Daily Star* (8 January 1997).

২৩. "Plan for Sub-regional grouping: Worst than 25year slavery treaty, says Khaleda," *The Daily Star* (10 January 1997), পৃ:. ১.১২; "How to resist evil design: Delhi to turn 3 countries into its provinces: BNP", *The Daily Star* (9 January 1997).

২৪. Kazi Ibne Shakoor, "WB has plans for the region" *Holiday* (17 April 1997), পৃ:. ১,৮।

২৫. "ADB eager to promote growth quadrangle : Dhaka has potential to become financial hub of the sub-region", *The Independent* (Dhaka, 11 July 1997), পৃ:৯।

২৬. "A Year on the Road to Progress, "*The Daily Star* (23 June 1997), পৃ:. ৯।

২৭. Syed Badruddin Hussain, "Sub-regional Bloc", *Sangbad* (19 January 1997); Munim Kumar Barai, "Co-operation Through Regional Arrangement: SAGQ and Answers to Some questions,"*The Daily Star* (10 June 1997); Shahed Latif, "Why we must have sub-regional co-operation?" *The Daily Star* (8 April 1997), পৃ:8; also his "South Asian Growth Quadrangle and Misplaced Nationalism," *The Daily Star* (24 April 1997), পৃ: 8; Md. Nuruzzaman," Sub-regional Co-operation and Political Dynamism in Bangladesh", paper presented at the ISAB Seminar (August 1997); M Shahiduzzaman, "South Asian Growth Quadrangle: Security and Transit Aspects" (Paper presented at BIISS, Dhaka, 18 August 1997).

২৮. Editorial, "Sub-regional grouping and relevance of SAARC," *Holiday* (4 April 1997), পৃ:. ২; Sadeq Khan, "After a charade: SAGQ," *Holiday* (1 April 1997), পৃ: ১, ৮; M. M. Rezaul Karim, "Sub-regional grouping in Eastern South Asia: Principles, Practice and Prognosis," *The Daily Star* (30 January 1997), পৃ: ৮; also his "South Asian Growth quadrangle: Ties of a Gordian Knot"? *The Daily Star* (10 April 1997): Mia, *প্রাগুক্ত* ।

২৯. Hassan Shahriar, "Trouble in the hills again?" *Holiday* (24 April 1998), পৃ:. ১,৮।

৩০. Abul Kalam, "Facts belie claims", *Holiday* (4, 11 July 1997).

৩১. Amanullah, *প্রাগুক্ত*, পৃ: ৮।

৩২. Suggeswara Senadhira, "Chandrika to voice opposition to sub-regional groupings," *The Daily Star* (13 May 1997), পৃ: ৫, ভারতে নতুন

বাজপেয়ীর নেতৃত্বাধীন সরকার শ্রীলংকার তামিলদের বিষয়ে "বন্ধু প্রতিম আগ্রহ" প্রদর্শন করা কলম্বো নয়াদিল্লীর মধ্যে সম্পর্ক 'চমৎকার' থাকবে কিনা এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। দ্রষ্টব্য Faruq Chowdhary "Sri Lanka and The BJPs' Friendly Concern", *The Daily Star* (1 May 1998); Jehan Perera, "The Other Side of the Jha Doctrine", *Holiday* (1 May 1998).

৩৩. Amanullah, *প্রাগুক্ত*, পৃ: ৮।

৩৪. ঐ।

৩৫. দক্ষিণ এশীয় উপ-আঞ্চলিক সংস্থা সম্পর্কিত ভবিষ্যৎ পাকিস্তানী দৃষ্টিভঙ্গী নির্ভর করছে প্রধানত পাক-ভারত সম্পর্কের ভবিষ্যতের ওপর। পাকিস্তানী সীমান্তে ভারতের ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েন, পাকিস্তানের মাঝারী পাল্লার ক্ষেপনাস্ত্র (ঘোরী)-র পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ এবং বাজপেয়ীর নেতৃত্বাধীন ভারত সরকারের পরিকল্পিত পারমাণবিক কর্মসূচী দু'দেশের মধ্যে সুসম্পর্কের ইঙ্গিতবাহী বলে বিবেচনা করা যায় না।

৩৬. Jagat S. Mehta, *Rescuing the Future: Coming to terms with Bequeathed Misperceptions* (Urban-Champaign, Ill: ACDIS Library, UIUC, 1995), পৃ: ১৬৩-১৬৪।

৩৭. ঐ।

৩৮. Hans H. Indorf, *Impediments to Regionalism in South East Asia: Bilateral Constraints Among ASEAN Member States* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1984), পৃ:. ৯।

৩৯. M. Anwarul Huq, "Dhaka preparing concept paper on Sub-regional grouping," *The Daily Star* (6 February 1997), পৃ:. ১.১২।

৪০. Abul Kalam, "Growth Diplomacy or Showmanship, প্রাগুক্ত; also his "D-8: Diplomacy beyond the immediate conflictual environment", *The Independent* (27 June 1997), পৃ:. ২; A Husnain, "Can D-8 take off ?", *The Daily Star* (23 June 1997), পৃ: ৮।